শিশু-সাহিত্য

বাঙ্গালার প্রতাপ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ, প্রণীত

প্রকাশক

এস্‌ সি মজুমদার

মজুমদার লাইব্রেরী

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

অনেক দিন হইল উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 'শিশু-সাহিত্য' রচনা করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। 'বাঙ্গালার প্রতাপ' সেই জন্যই লিখিত হইয়াছিল। নানা কারণে এতদিন প্রকাশ করা ঘটে নাই। বঙ্গদর্শন সম্পাদক বন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিশু সাহিত্য প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি।

নাটোর (রাজসাহী)
২৬শে আশ্বিন, ১৩১৯ } শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।
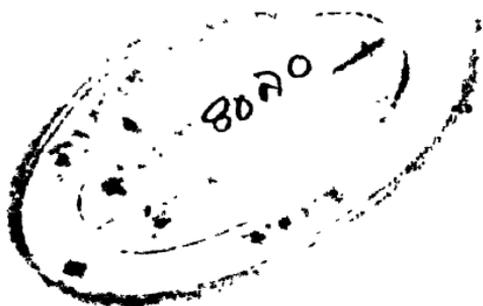
বাঙ্গালার প্রতাপ

(শিশু-সাহিত্য)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে এক সোনার দেশ। যে দেশের বকুল গাছে কোকিল ডাকে, আমের ডালে ফিঙ্গে নাচে, পাতার আড়ালে দোয়েল শিস্ দেয়—যে দেশের নীল আকাশে রবি ওঠে, কুলু কুলু নদী ছোটে, আপন মনে ফুল ফোটে, সে দেশের নাম বাঙ্গালা দেশ। তার মিষ্ট জল, মিষ্ট ফল, আর সব চেয়ে মিষ্ট তার ক্ষেতে-ভরা পাকা ধান। সে ধান হাওয়ায় নাচে, রোদে হাসে—আর যখন ভারে ভারে ঘরে ওঠে, তখন কত দেশের সিন্দুকে সোনার টাকা ঝম্ ঝম্ করে। তোমাদেরই মত চৈতন্য, রঘুমণি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, প্রতাপ, সীতারাম, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, সে দেশের ছেলে—ছেলে ত

নয়, যেন এক একটা মাণিক। অমন কত আছে, তোমাদেরই মধ্যে আবার কত জন হবে।

সে আজ অনেক দিনের কথা—ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন আকবর। তাঁকে লোকে বাদশাহ বল্‌তো—এখনো বলে। এখন যেমন বাঙ্গালার কর্ত্তা লাট সাহেব—তখনো তেমনি বাঙ্গালার কর্ত্তাকে সুবাদার বল্‌তো। তিনিও একটা ছোট-খাটো বাদশাহ ছিলেন। বড় বাদশাহের কাছে দিল্লীতে খাজানা পাঠাতে পারলেই তার কাজ হতো—তার পর তিনি যা খুসি তাই কর্‌তেন। কেউ তা' দেখতে আস্‌তো না।

বাঙ্গালার বাদশাহ্ গৌড়ে থাকতেন। গৌড় নগর মস্ত নগর ছিল। এখন যেখানে মালদহ আছে, তার কাছেই সাত আট ক্রোশ লম্বা গৌড় সহর ছিল। তার পশ্চিম দিয়ে কুল্ কুল্ করে' ভাগীরথী নদী বয়ে যেত। এখন সেখানে ঘন বন—সে বনে মস্ত মস্ত বাঘ থাকে। কিন্তু তখন তেমন ছিল না। যখন হিন্দুরা গৌড়ের রাজা ছিলেন, তখন সেখানে কত সুন্দর সুন্দর মন্দির, বড় বড় বাড়ী, লম্বা লম্বা পুকুর ছিল। তার পর যখন পাঠানগণ গৌড়ের সিংহাসনে বস্‌লেন, তখন তাঁরা সে সব মন্দির ভেঙ্গে তারই ইট কাঠ পাথর নিয়ে কত রাজপুরী, কত মস্‌জেদ, কত সিংহদ্বার প্রস্তুত করলেন। আজো তার কতক কতক দেখতে পাওয়া যায়: গৌড়ের রাজবাড়ীতে যাবার পূর্ব্বদিকে একটা দরজা ছিল—সুল্‌তান সুজা হাতীর পিঠে হাওদা বেঁধে সেই দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন! দরজার মাথায় বসে' বাজনদারেরা বাজনা বাজাতো। সবুজ, নীল, শ্বেত, পীত, নানা

বর্ণের ইট দিয়ে, কত মূল্যবান ভাল ভাল পাথর দিয়ে গৌড়ের বড় বড় বাড়ী হয়েছিল! কোন কোন মস্‌জেদের গম্বুজ সোনার পাতে ঢাকা ছিল! সে কালের সেই কদম রসুল, ছোট সোনা মসজেদ, লোটন মস্‌জেদ প্রভৃতির মত বাড়ী এ কালে আর হয় না! কলিকাতার যে অতবড় মনুমেণ্ট, তারও গায়ে গৌড়ের ভাঙ্গা-দালানের ইট আছে!

গৌড়ের সে সব ঘরের ফুলকাটা দেওয়াল আর মস্ত মস্ত থাম্ দেখে লোকে এখন হাঁ করে থাকে, আর ভাবে যে কোন্ দেশের কারিকরই না জানি সে সব করেছিল। কিন্তু বল্‌তে কি, আমাদের এই সোনার দেশের খড়ের ঘরের মধ্যেই সে সব কারিকর জন্মেছিল। এই সোনার দেশের শীতল বাতাসেই তারা আমাদের মত বড়-সড় হয়েছিল।

সেই গৌড়দেশের রাজা সোনার সিংহাসনে বসে' বিচার কর্‌তেন। সিংহাসনের মুক্তার ঝালর ঝল্ ঝল্ করে' ঝুল্‌তো। যখন সোনার প্রদীপে গন্ধতেলের বাতি জ্বলে উঠ্‌তো, তখন সেই সিংহাসন আর সেই ঘরের দেয়ালের গায়ের চক্‌চকে পাথর ঠিক হীরার মত ঝিক্‌মিক্ করতো।

গৌড়ে কেমন বিচার হ'তো তার একটা গল্প বলি। তখন গিয়াসউদ্দীন গৌড়ের রাজা ছিলেন। একদিন রাজবাড়ীর ছাদে বসে, তিনি ধনুকে তীর ছাড়ছেন, হঠাৎ একটা তীর এক বিধবার পুত্রের গায়ে লেগে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগলো। বিধবা কেঁদে গিয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে (তাঁকে কাজি-উল্-কজ্জাক

বল্‌তো) নালিস করলে। শাহ সিরাজুদ্দীন তখন প্রধান কাজি। রাজাকে বিচারশালায় আনার জন্য তিনি অমনি বরকন্দাজ পাঠালেন!

বরকন্দাজের সাধ্য কি যে রাজাকে ধরতে রাজবাড়ীতে যায়! সে তখন ধর্ম্ম-মন্দিরে ঘণ্টা দিতে লাগলো। রাজা বল্লেন, "অসময়ে কে আজান দেয় রে—তাকে ধরে নিয়ে আয়!"

লোক-জনেরা ছুটে চল্লো। গিয়েই দেখে, প্রধান কাজির বরকন্দাজ! রাজার আদেশ—তারা বরকন্দাজকে ধরে নিয়ে এলো।

রাজা বল্লেন, "কেন তুমি অসময়ে আজান দিচ্ছিলে?" সে জোড়হাতে বল্‌লে "জাঁহাপনা! কসুর মাপ হয়—আপনাকে কাজি সাহেবের কাছে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। অসময়ে আজান দিলেই আপনি আমাকে ধরে আন্‌বেন—তা' হলেই আমি কাজির হুকুম আপনাকে জানাতে পারবো বলে' আজান দিয়েছি।"

রাজা বল্লেন, "কৈ, হুকুম দেখাও।"

বরকন্দাজ হুকুম দেখালে। কি সর্ব্বনাশ! রাজাকেই ধরে নিয়ে যাবার হুকুম! কাজি রাজারই একজন বড় নফর বই ত নয়—তার এতদূর স্পর্দ্ধা! সভাশুদ্ধ লোক অবাক্—কি না জানি হয়!

রাজা একখানা ধারাল তরোয়াল পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বল্লেন, "চল, কাজির কাছে যাব।"

বিচার-আসনে কাজি বসে আছেন। কত লোকের বিচার হচ্ছে। সেই বিধবাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে। রাজা সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। রাজাকে দেখে কাজি আসন ছেড়ে উঠলেনও না,

বল্লেন, "আপনি এই বিধবার ছেলের গায়ে তীর মেরেছেন—একে সন্তুষ্ট করুন!"

রাজা তখন অনেক অর্থ দিয়ে বিধবাকে তুষ্ট করলেন।

কাজি তখন বিচার আসন থেকে নেমে এসে রাজাকে যথোচিত সম্মান কর্‌লেন। রাজা বল্লেন, "আমি এ দেশের রাজা বলে' আপনি যদি আমার খাতিরে ন্যায় বিচার না কর্‌তেন, তা হ'লে আজ এই তরোয়াল দিয়ে আপনার মাথা কেটে নিতেম।"

কাজিও অমনি তাঁর আসনের নিচে থেকে একগাছি বেত নিয়ে বল্লেন, "আপনি যদি শাস্ত্রের আদেশ মত অপরাধের দণ্ড না নিতেন, তা হ'লে এই বেতের ঘায়ে আপনার পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বের করতেম! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সব দিক রক্ষা হ'লো!" দেশের লোক রাজা ও কাজি দু'জনকেই ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

গৌড়ের জল-হাওয়া বড় খারাপ হ'তে লাগলো দেখে সুলতান সোলেমান করবাণী বল্লেন, "আর আমি এখানে থাকবো না, চল টাঁড়ায় যাই।" গৌড় থেকে রাজমহলে যাওয়ার পথে পাগলা নদীর তীরে টাঁড়া নগর নির্ম্মিত হয়েছিল।

সুলতান টাঁড়ায় গেলেন, কাজেই লোক-লস্কর সবই সেখানে গেল। ভাল ভাল পথের ধারে বড় বড় বাড়ী হ'লো। বাড়ীর দুয়ারে দ্বারী বসলো। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গড়বন্দী করা রাজপুরী কিছুরই আর অভাব থাকলো না। সিপাহীরা পাহারা দিত, সওদাগর নির্ভয়ে কেনা-বেচা করতো—চোর ডাকাত তখন বড় কম ছিল।

তোমরা যে কালাপাহাড়ের নাম শুনেছ, সেই কালাপাহাড় সোলেমানের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর ভাল নাম ছিল কালাচাঁদ। রাজসাহী জেলার মান্দা থানায় বীরজাওন নামে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল। কালাচাঁদ যেমন সাহসী তেমনি সুন্দর ছিলেন। যুদ্ধ করতে, ঘোড়ায় চড়তে তখন তাঁর মত আর এক জন পাওয়া যেত না। কালাচাঁদ চাকুরীর জন্য গৌড়ে এলেন।

তাঁকে দেখেই রাজকন্যা বল্লেন "আমি একেই বিয়ে করবো।" সর্ব্বনাশ! কালাচাঁদ যে হিন্দু—রাজকন্যা যে মুসলমান! বিয়ে না করলেই শূলের উপর প্রাণ যায়—কালাচাঁদ রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। হিন্দুরা তা বুঝলে না—কালাচাঁদকে বড় যাতনা দিতে লাগলো। যাতনায় অস্থির হয়ে তিনি শেষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। দেব-দেবীর মূর্ত্তি ভেঙ্গে চূড়মার করে দিলেন—উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত আগুনে ফেলে দিলেন। লোকে ঘৃণা করে, তাঁকে কালাপাহাড় বলতো।

সোলেমান সুলতান মরে গেলেন—কিছু গোলমালের পর তাঁর ছোট ছেলে দায়ুদ পিতার মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে এসে বসলেন। সুলতানের দপ্তরে তখন শ্রীহরি আর জানকীবল্লভ নামে দু'জন বুদ্ধিমান বাঙ্গালী কাজ করতেন।

দায়ুদ দেখলেন তাঁর ঘরে আর টাকা ধরে না। এদিকে হাজার হাজার সিপাহীও তাঁর। তারা বন্দুক ঘাড়ে করে, তরোয়াল নিয়ে খাড়া। তিনি ভাবলেন আমি কি তবে আকবরের

চেয়ে ছোট ? আমার হাতী ঘোড়া লোক-জন হীরা-মণি-মাণিক এত থাকতে আমি কেন ছোট হতে যাব ! ছি ! অমনি তিনি মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, "মন্ত্রি ! আকবর বাদশার কাছে, আর খাজানা পাঠিও না—আমার টাকা আমারই থাকবে।" সেনাপতিকে বল্লেন, "হাতী সাজাও, ঘোড়া সাজাও,—সৈন্যদের ভাল ভাল বন্দুক দাও—চল, আমরা মোগল বাদশাহ আকবরের রাজ্য জয় করতে যাই।"

যেমন আদেশ তেমনি হ'লো ; হাতীর পিঠে হাওদা চড়লো, ঘোড়ার পিঠে জিন্ উঠলো, দুম্ দাম বন্দুক ফুটতে লাগলো। ঝম্ ঝম্ বাজনা বাজতে লাগল। দশ হাতিয়ার বেঁধে সুলতান বের হ'লেন—পাঁচ হাতিয়ার নিয়ে সেনাপতি চল্লেন—সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সামন্ত চললো। সুলতান বল্লেন, "আজ থেকে আমি স্বাধীন—এ বাঙ্গালা আজ থেকে আমার।"

সুলতানের সুলতান আকবর—সিংহাসনে বসে থাকতে থাকতে তাঁর মাথার টনক নড়লো। তিনি ভাবলেন, "তাই ত—এ হলো কি ?" মন্ত্রী বল্লেন, "জাঁহাপনা ! এ হ'লো কি ? বাঙ্গালা দেশ—সোনার দেশ। সে দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে উপায় !" সেনাপতি তখন টপ্ করে খাপ্ থেকে তরোয়াল নিয়ে বল্লেন "কিছু ভয় নাই—আমি আছি।" অমনি দিল্লী নগরে সাজ সাজ রব উঠলো। মোগল সাজলো, পাঠান সাজলো, হিন্দু সাজলো, মুসলমান সাজলো। পিঁপড়ের সারের মত যোদ্ধা বেরিয়ে বাঙ্গালার দিকে ছুটতে লাগলো। একটা কালো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার

হ'য়ে সেনাপতি মুনিম্ খাঁ বাঙ্গালা আর বিহার জয় করতে চল্লেন। ছোট ছোট কয়েকটা যুদ্ধ হয়েই তখনকার মত সব গোলমাল থেমে গেল।

শ্রীহরি আর জানকীবল্লভ দুই ভাই। দায়ুদ তাঁদের বড় ভালবাসতেন। তাঁরাও দেখলেন বাদশাহ আকবর যখন বিরূপ, তখন কোন্ দিন বা দায়ুদেরও প্রাণ যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও মাথা কাটা পড়ে! দুই ভাই একদিন দায়ুদের কাছে জোড় হাতে দাড়িয়ে বল্লেন, "জাঁহাপনা! আমাদের একটা ভিক্ষা আছে।" দায়ুদ বল্লেন, "কি ভিক্ষা?" শ্রীহরি বল্লেন, "আমি বুড়া হয়েছি এখুন রাজকায্য থেকে অবসর নিতে চাই।" সুলতান তাঁদের বড় ভাল বাসতেন, বিশ্বাসও করতেন। বল্লেন "আপনাদের মত আমার বন্ধু আর নাই; আমি আপনাদের কিছু জমি দিচ্ছি—আপনারা জায়গা পছন্দ করুন।"

দুই ভাই তখন সুলতানকে অনেক সেলাম কল্লেন। সুলতান বল্লেন, "আজ থেকে **শ্রীহরির** নাম হলো **মহারাজ বিক্রমাদিত্য** আর **জানকীবল্লভ** হলেন **রাজা বসন্তরায়**।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বড় সুচতুর ছিলেন। তিনি বেছে বেছে একটা জায়গা স্থির করলেন—তার নাম সুন্দরবন। এখনো সে বন আছে। এখনো সেখানে দিন রাত বড় বড় বাঘ ডাকে —লাফ দিয়ে হরিণ ধরে, দাঁতালো শূকর চলে বেড়ায় -লতা ছিঁড়ে, আর কখন কখন গণ্ডারগুলো ডেকে ডেকে বন কাঁপিয়ে

তোলে। সে বনে খালের অন্ত নাই, বিলের অন্ত নাই। সে সব খালে বিলে কেউ নামে না—এত কুমীরের ভয়!

সুন্দরবন কি চিরদিনই এমনি ছিল? তা ছিল না। সেখানে কত লোক বাস করতো। তাদের ঘরে ঘরে তোমাদেরই মত রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলে মেয়েরা হাস্‌তো—খেল্‌তো—নাচতো। তার পর মগ আর ফিরিঙ্গি ডাকাতের দল রাক্ষসের মত ফিরতে লাগলো! এখন আমরা যে দেশকে ব্রহ্মদেশ বলি মগেরা সেইখানে থাক্‌তো। আর ফিরিঙ্গিরা থাকতো সাত সমুদ্র তের নদীর পার পর্টুগাল দেশে। বাঙ্গালায় বাণিজ্য করতে এসে তারা শেষে ডাকাত হয়েছিল। তাদের অত্যাচারে গ্রামের লোক-জনেরা পালিয়ে গেল। গ্রাম নগর যা ছিল, সব ক্রমে ক্রমে বন হয়ে উঠলো।

বন ঘুরে ঘুরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেখলেন, সে বনে বাঘ আছে, ভালুক আছে, খাল-বিল-নদীর মোহানা আছে, বনের ধারে নীল সমুদ্র বড় বড় ঢেউ তুলে গর্জ্জন করে বেড়াচ্ছে—আর সেখানে আছে ছোট একটা মন্দির, আর সেই মন্দিরমধ্যে মহাদেবী যশোরেশ্বরী। মহারাজ খোঁজ করতে লাগলেন এ মহাবনে মন্দির কে নির্ম্মাণ করলে। অনেক অনুসন্ধান ক'রে শুনলেন যে অনরি নামে এক ব্রাহ্মণ অনেকদিন আগে মহাদেবীর যে মন্দির করেছিলেন তার একশ'টা দুয়ার ছিল। কালে সে মন্দিরের গায়ে ছোট ছোট গাছ গজালো—গাছ বড় হলো—শেষে একদিন মন্দিরকে নিয়ে মাটিতে ভেঙ্গে পড়লো। তারপর অনেকদিন গেল—কেউ আর খোঁজ করে না।

একবার এক ক্ষত্রিয় রাজা এলেন—নাম তাঁর ধেনুকর্ণ। তিনি এসে শুনলেন যে ঐখানে সতীদেবীর হাত আর পা পড়েছিল। অমনি তিনি বন কাটালেন, গাছ সরালেন, বাঘ তাড়ালেন। ঝোপ-ঝাপ যা' ছিল সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ধেনুকর্ণ মাটি কেটে ইট গড়ালেন, কাঠ কেটে পাঁজা পোড়ালেন—দেখতে দেখতে যশোর-দেবীর নূতন মন্দির মাথা তুল্লো।

আবার কিছুকাল গেল। তখন বাঙ্গালার এক রাজা ছিলেন লক্ষ্মণসেন। তিনি সেই বনের খানিকটা জায়গা নিয়ে এক গ্রাম বসালেন—তার নাম দিলেন সেনের হাট। বনের মধ্যে গ্রাম বসলো—গ্রামে হিন্দু এসে বাস করতে লাগলো। রাজা তখন যশোর দেবীর মন্দিরের কাছেই শিব-মন্দির গড়ে দিলেন।

এই সব খোঁজ-খবর নিয়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সেইখানেই বাস করবেন স্থির করলেন। সে স্থানকে লোকে তখন যশোর বলে জানতো। তখন কাঠুরে এল, করাতি এল, গৌড়ের ভাল ভাল মিস্ত্রী এল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের লোক-জন এসে মহানন্দে যশোর নগর তৈয়ারী করতে আরম্ভ করলে। সে কি আজকের কথা? তার পর তিন শ' বছরেরও বেশী চলে গেছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাদশাহ আকবর যখন শুনলেন যে, তাঁর সেনাপতি মুনিম্ খাঁ দায়ুদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করবেন না—তাঁর সঙ্গে মিট্‌মাট্ করেছেন, তখন তিনি বড় রাগ করলেন। দায়ুদও বন্ধুতা করে বন্ধুর মত ব্যবহার করলেন না। আবার দুই পক্ষে যুদ্ধ বেধে গেল। এবার মুনিম্ খাঁর বদলে রাজা তোড়রমল্ল বলে' আকবরের সব চেয়ে বড় সেনাপতি নিজেই কর্ত্তা হ'য়ে এলেন—দায়ুদের মাথা কাটতেই হ'বে!

যুদ্ধ হ'তে লাগলো। কত হাতী মলো, ঘোড়া কাটা পড়লো—কত হিন্দু মলো, মোগল-পাঠানের মুণ্ড গড়াগড়ি যেতে লাগলো। দায়ুদও পণ করে বস্‌লেন, 'যায় প্রাণ যাবে—যুদ্ধই করবো।' যুদ্ধ করতে করতে দায়ুদ যেই পাটনা সহরে গেলেন, অমনি তোড়রমল্লের সৈন্য-সামন্ত এসে তাঁকে ঘিরে ধরলো। বাঘ যেমন খাঁচার মধ্যে বদ্ধ হয়, দায়ুদও তেমনি বদ্ধ হ'লেন।

বড় আনন্দের ধূম প'ড়ে গেল—দায়ুদ যে ফাঁদে পড়েছেন। দিন-রাত লড়াই করে, যে সব সৈন্য-সামন্ত বড় শ্রান্ত হয়েছিল তারা দু'দিন ঘুমিয়ে বাঁচলো। ঘোড়াগুলোর পিঠের জিন খস্‌লো, হাতীর হাওদা নামলো—তারা ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘাস-জল চারা-দানা খেতে লাগলো। আকবর বাদশাহ তখন আগ্রা সহরে ছিলেন। লোক-জন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তিনি নিজেই বাঙ্গালার দিকে ছুটলেন। বাঙ্গালা দেশ সোনার দেশ—ধনে ধানে, জলে ফলে ভরা—তার

ধূলোর সঙ্গে হীরা জ্বলে, মাটি থেকে মাণিক ফলে। এমন দেশ ত আর কোথাও নাই; তাই আকবর নিজেই ছুটলেন, দায়ুদের মাথা কেটে বাঙ্গালা নিজের হাতে রাখবেন।

'জয় আকবরের জয়, জয় দিল্লীশ্বরের জয়' বল্‌তে বল্‌তে তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগলো। তাদের কাঁকালে তরোয়াল, হাতে বর্শা, কারো পিঠে বন্দুক। গরুর গাড়ীতে বড় বড় কামান —খচ্চর গুলোর পিঠে বারুদ। আকবর বাদশাহ আস্‌তে লাগলেন। ঘোড়া দেখে, হাতী দেখে, লোক-লস্কর সিপাহী দেখে, বন্দুকের দুড়ুম্ দুড়ুম্ কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শুনে গ্রামের লোক-জন সব দূরে পালিয়ে গেল—বাপ্ রে! আকবর বাদশাহ যুদ্ধ করতে আস্‌ছেন। সিধু পালালো নিধু পালালো, হারাধনের ভাই পালালো —রামসিং পালাতে না পেরে একটা গাছের মাথায় উঠে বসে থাকলো! সকলের মুখেই এক কথা—বাপ্ রে! আকবর বাদশাহ আস্‌ছেন!

আকবর আস্‌তে আস্‌তে প্রয়াগ নগরে ছাউনি করলেন। ছোট বড় হাজার হাজার তাম্বু পড়লো। সৈন্য-সামন্ত আপন আপন অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতে লাগলো—বাজন্‌দারেরা বাজনা বাজাতে লাগলো। বাদশাহ বল্লেন, "মন্ত্রি! দেখ কেমন সুন্দর স্থান। গঙ্গা আর যমুনা ঐ দেখ, এইখানে এসে এক সঙ্গে মিশে গেছে। আমার হিন্দু প্রজারা বলে যে এখানে এসে স্নান করলে আর পাপ থাকে না। এখানে একটা গড় তৈয়ারী করলে কেমন হয়?" মন্ত্রী বল্লেন, "জাঁহাপনা এখানে একটা কেল্লা করলে ভালই হয়। তা হ'লে

এদিকে আর কোন শত্রু আস্‌তে পারবে না।" আকবর তখন প্রয়াগে একটা গড় তৈয়ারী করতে আদেশ দিলেন। সেই অবধি প্রয়াগের নাম ইলাহাবাদ (এলাহাবাদ)। এখনো এলাহাবাদে গেলে আকবর বাদশাহের গড় দেখতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার বাদশাহ দায়ুদ ত তখন পাটনায় বন্দী। চারিদিকে পাহারা, দায়ুদ আর পালাতে পারেন না। হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি নৌকায় চড়ে, পাটনা ছাড়লেন; তোড়রমল্ল দেখলেন দায়ুদ নাই! ধর্ ধর্! খোঁজ খোঁজ, দায়ুদ কোথায় গেলেন ত্থাখ্!

ছোট-বড় নৌকা ছুট্‌লো, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার গেল, বনে-জঙ্গলে প্রহরী ছুট্‌লো। দায়ুদকে আর পাওয়া গেল না! তোড়রমল্ল বল্লেন, "দায়ুদ ত নাই, তাঁর বাঙ্গালী নফর দুইটা কই?"

আবার লোক-জন বা'র হ'ল। বাড়ী খুঁজে ঘর খুঁজে, বন-জঙ্গল তল্লাস করে, নদীর মধ্যে নৌকা ধরে' তারা আর কিছুতেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের খবর পেলো না—রাজা বসন্ত-রায়কেও আর দেখা গেল না! সেনাপতি বল্লেন, 'তা আমি ছাড়ব না। আমি মাটি খুঁড়বো, সাগর ছেঁচবো, নদী শুকিয়ে দেখ্‌বো—দায়ুদকে আমি ছাড়ব না!'

দিন যায়, মাস গেল—লোক-জনেরা শ্রান্ত হয়ে পড়লো, তবু দায়ুদের খবর হলো না। একদিন হঠাৎ জানা গেল দায়ুদ রাজমহলে পালিয়ে আছেন। আবার হাঁক ডাক হ'তে লাগলো—ধর্ ধর্! মার মার! চারিদিক থেকে মোগলসৈন্য এসে রাজমহলেই দায়ুদকে ঘিরে ফেল্লে।

তখন দুই দলে যুদ্ধ লাগলো। গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ করে মোগলের কামান গর্জ্জে উঠলো—দুম্ দুম্ করে বন্দুক ফুট্তে লাগলো। আগুনে রাঙ্গা হ'য়ে বড় বড় লোহার গোলা সৈন্যদের মধ্যে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে সৈন্য মরে গেল। কারো হাত কাটলো, কারো পা কাটলো, কারো বুকের মধ্যে বন্দুকের গুলি গেল। তরোয়ালের ঘায়ে কারো মুণ্ডটা ছিট্‌কে দশ হাত দূরে গড়িয়ে পড়লো! চারিদিক থেকে রক্তের নদী বয়ে চল্‌লো!

দায়ুদ আর থাকতে পারলেন না—ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিয়ে তাঁর সৈন্যদের কাছে দৌড়ে গেলেন। হঠাৎ কাদার মধ্যে ঘোড়ার পা ডুবে গেল। চাবুকের উপর চাবুক—ঘোড়া আর পা তুল্‌তে পারলে না! অমনি মোগলসৈন্য এসে তাঁকে আবার বন্দী করলে। বাঙ্গালার বাদশাহ ধরা পড়লেন - তাঁর মাথা কেটে নিয়ে মোগল-সৈন্য মহা আনন্দে সম্রাট আকবরের কাছে চলে গেল! দায়ুদের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়ের পাঠান-রাজত্ব শেষ হ'লো!

দায়ুদ গেলেন, বাঙ্গালা গেল, সৈন্য-সামন্ত সব গেল দেখে বিক্রমাদিত্য আর বসন্তরায় শেষে তোড়রমল্লের শরণ নিলেন। দায়ুদের যত টাকা কড়ি ছিল আগেই তাঁরা গোপনে যশোরে পাঠিয়ে দিলেন।

তোড়রমল্ল বল্লেন, "মহারাজ! ভয় নাই। আমি আপনাদের কিছু বলবো না। বাঙ্গালার সব কাগজ-পত্র আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

মহারাজ বিক্রমাদিত্য অমনি তাই করলেন দেখে সম্রাট্ আকবর সন্তুষ্ট হ'য়ে আদেশ দিলেন, "মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে যশোরের ভূঁইয়া করা গেল। তাঁরা বছর বছর যশোরের খাজানা দিবেন।"

বিক্রমাদিত্য বাদশাহের জয় বল্‌তে বল্‌তে ভাইকে আগে যশোরে পাঠিয়ে দিয়ে কিছুকাল পরে নিজেও রওনা হ'লেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভোর হয়েছে। রাঙ্গা রবি নাচ্‌তে নাচ্‌তে হাস্‌তে হাস্‌তে জলের ভিতব থেকে নীল আকাশে উঠছেন। নদীর জলে কে যেন সোনা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। সোনার দেশ বাঙ্গালা দেশের নদী, কুল্ কুল্ তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে। গাছের ডালে টিয়া ডাকছে, বুল্ বুল্ উড়ছে। বনের মধ্যে ফুল ফুটেছে কত—লাল নীল হলুদ সাদা নানা রঙ্গের ফুল। যশোরেশ্বরীর মন্দিরে তখন ঝন্ ঝন্ করে কাঁসর বাজ্‌চে—এমন সময় নদীর ঘাটে ডঙ্কা পড়্‌লো, শানাই বাজলো, বন্দুকের শব্দ হলো।

রাজা বসন্তরায় কেবল ফুলেব বাগানে এসে দাঁড়িয়েছেন, আবার ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হলো। রাজা বল্লেন, "কে আছিস, দেখে আয় ত নদীর ঘাটে অত গোলযোগ কিসের।" বল্‌তে না বল্‌তেই একটা নফর দৌড়ে এসে বল্লে "রাজা মশায়! চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঘাটে এসেছেন।"

যশোর নগরে তখন একটা ভারি গোলযোগ আরম্ভ হ'লো। কেউ বলছে 'বেহারা কৈ রে,' কেউ বল্‌ছে 'চৌদোলা আন্'—কেউ বা রাজবাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে কলার গাছ পুঁতে কলসি ভরে জল রাখছে। দেখতে দেখতে নগর সেজে উঠলো, দেউড়ীতে নহবৎ বাজতে লাগলো, বাড়ীতে বাড়ীতে লাল নীল হলুদ রঙ্গের নিশান উড়লো। ছেলে মেয়ে বুড়ো যে যেখানে ছিল মহারাজকে দেখতে নদীর ঘাটে ছুটে চল্‌লো। দোলায় চড়ে গেলেন রাজা বসন্তরায়, আর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ছোট একটী ছেলে নাম তার প্রতাপ।

মহারাজ যশোরে এলেন; কেউ শাঁখ বাজালো, কেউ দোলার উপর ফুলের মালা ফেলে দিলে, মেয়েরা হুলুধ্বনি করতে লাগলো। রাজবাড়ীর নফর-চাকর তখন গরীব দুঃখীদের টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করলে।

দিন যায় মাস যায়, মহারাজ সিংহাসনে বসে বিচার করেন। রাজা বসন্তরায় যেন রামের ভাই লক্ষ্মণ—দাদাকে না বলে কোন কাজেই হাত দেন না। দিন যায় মাস যায়, বিক্রমাদিত্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে দিলেন—যশোরের লোক আরবী ফারসী সংস্কৃত বাঙ্গালা পড়ে' পড়ে' পণ্ডিত হ'তে লাগলো। দিন যায় মাস যায়, মহারাজ নানা স্থান থেকে ভাল ভাল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনিয়ে, কাউকে জমি দিলেন, কাউকে টাকা দিলেন, কা'রো ঘর-বাড়ী করে দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যশোর ভরে উঠলো। নানা দেশের পণ্ডিত এসে রাজার সভায় থাকতে

লাগলেন। মহারাজের ছোট ছেলে প্রতাপ তাঁদের কাছে বসে' লেখা পড়া শিখতেন।

দিন গেল—মাস গেল—বছর গেল। ছোট এতটুকু প্রতাপ বড় হলেন, দেখতে না দেখতে আরবী শিখলেন, ফারসী শিখলেন, বাঙ্গালা শিখলেন, সংস্কৃত শিখলেন, আর শিখলেন তীব চালাতে তরোয়াল চালাতে বল্লম দিয়ে বর্শা দিয়ে বাঘ ভালুক শীকার করতে—বন্দুক দিয়ে গণ্ডার মারতে। ছোট প্রতাপ—বালক প্রতাপ—এই সোণার দেশ বাঙ্গালার প্রতাপ—আমাদের যশোরের প্রতাপ—তাঁর বন্দুকের মুখে দাঁড়ায় কে? তিনি বর্শা ছুঁড়লে আটকায় কে? বাণ মারলে মরে না কে? প্রতাপের সঙ্গে তখন কেউ পারতো না।

দিন গেল—মাস গেল—বছর গেল—এতটুকু প্রতাপ আরও বড় হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বামুন-পাড়ার শঙ্কর আর গুহ-পাড়ার সূর্য্যকান্তও বড় হতে লাগলেন। তিন জনের মিতালিও দিন দিন বেড়ে উঠলো।

এমনি ভবে' দিন যেতে লাগলো। মহারাজ বিক্রমাদিত্য যশোর দেশে কত গ্রাম বসালেন, হাট বসালেন। বন-জঙ্গল কেটে গোলা-গঞ্জ হ'লো। দোকানী এল, পসারী এল, দেশ-বিদেশের সওদাগর আসতে লাগলো। যশোব দেশ যেন হৈ-হৈ রৈ-রৈ হয়ে উঠলো। যেমন বাজার হ'লো হাট হ'লো, গোলা হ'লো গঞ্জ হ'লো, তেমনি দেব-দেবীর সুন্দর সুন্দর মন্দির হ'লো—মন্দিরের কাছে অতিথিশালা বসলো। সেখানে যে যায় সে-ই—খেতে পায়, কাপড় পায়, থাকতে পায়।

চারিদিক থেকে প্রতাপের বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগলো। অমন ঘর, অমন বর পায় কে? সাত রাজার ধন এক মাণিক প্রতাপ। বিক্রমাদিত্য তাকে যত ভালবাসতেন, রাজা বসন্ত রায় তার চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। যশোরের রাজার ছেলের বিয়ে—দৈ দে সন্দেশ দে—একমাস ধরে ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাকি আর থামে না। কে কত খায়! শেষে নফর-চাকরেরা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে! সাতদিন ধরে' টাকার হরি-লুট হ'লো। বেনারসী সাড়ী পরে' হীরা-মতির গহনায় সেজে, সোণায় মোড়া মুক্তায় বাঁধা দোলায় চড়ে রাঙ্গা টক্‌টুকে বৌ এল। লোকে বল্লে যশোরের লক্ষ্মী রাজার ঘরে এসেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন যায়, মাস যায় কিন্তু বুড়ো রাজার মন যেন রোজই ভার হ'তে লাগলো। তিনি যতই শোনেন আজ প্রতাপ বাঘ মেরেছে, কাল প্রতাপ হরিণ ধরেছে, পরশু প্রতাপ বুনো শূকরের দাত ভেঙ্গেছে, অমনি তাঁর মুখ কালি হ'য়ে উঠে। তিনি ভাবেন, 'এ হলো কি? প্রতাপটা এমন হ'লো কেন!' এই সব ভেবে চিন্তে একদিন স্নান করে' তিনি হরিনাম শুনছেন, অমনি আকাশ থেকে একটা চিল ছট্‌ফট্ করতে করতে তাঁর পায়ের উপর এসে পড়লো। চিলের ঘাড় ভেঙ্গে পড়েছে; নাকে মুখে হুহু রক্ত ঝরছে, বুকের মধ্যে একটা ধারাল তীর।

বুড়ো রাজা ত হরি হরি বলে' দশ হাত সরে গেলেন। রাগের আর সীমা নাই। দাস দাসী যে যেখানে ছিল তাদের ডেকে বল্লেন, 'শিগ্ গীর দ্যাখ কে এমন কাজ করেছে!' তারা এসে বল্লে, 'কুমার প্রতাপ পক্ষীকে বাণ মেরেছিলেন।'

বুড়ো রাজা আর বিলম্ব করলেন না। অমনি ঠাকুর দালানে উঠেই বল্লেন, 'বসন্তকে ডাক।' দুই ভাইয়ে তখন পরামর্শ হ'তে লাগলো। রাজা বসন্তরায় বল্লেন—

"দাদা, এও কি সম্ভব! প্রতাপ যে আমাদের বড় আদরের দুধের ছেলে। আপনার মিথ্যা ভয় দূর করুন। সে কি কখনো আপনার কি আমার গলায় ছুরি দিতে পারে!"

বিক্রম। পারে বৈ কি। প্রতাপের কোষ্ঠীতে তাই লেখা আছে।

বসন্ত। তা থাক্। গণৎকারে গুণ্‌তে ভুল করেছেন। প্রতাপের মত সুবোধ ছেলে কি আছে?

বিক্রম। বসন্, আমি বুড়ো মানুষ—আমার কথা শোন। তা না শুন্‌লে শেষে বিপদ হবে! প্রতাপকে কিছুদিন আগ্রায় বাদশাহের দরবারে পাঠাও। সেখানে নানা রকম দেখে শুনে ওর মন ফিরবে—দয়া মায়া হবে। শেষে তাই হ'লো। দাদার কথা বসন্তরায় ঠেল্‌তে পারিলেন না। বিশখানা নৌকা সাজলো, বাদশাহের জন্য সোণা রূপার ভেট উঠলো—যশোরের রাজকুমার প্রতাপ আগ্রায় চল্লেন। রাজা বসন্তরায় প্রতাপকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে এলেন।

* * *

কল্ কল্ করে' পদ্মা নদী বয়ে যাচ্ছে। সে নদীর পার দেখা যায় না। বাতাসে নৌকার পাল ফুলেছে—নদীর বুকে বড় বড় ঢেউ উঠেছে। সেই ঢেউ ভেঙ্গে জল কেটে প্রতাপের বিশখানা বড় নৌকা তীরের মত ছুটেছে। প্রতাপের মুখ ভার—চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ক্রমে পূবের রবি পশ্চিমে গেল। আকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠলো। নদীর বুক যেন রক্তমাখা হ'লো। শেষে রাঙ্গা রবি টুপ্ করে' নদীর জলে ডুবে গেল। তখনো নৌকা চলছে ছল্ ছল্, জল ডাকছে কল্ কল্।

প্রতাপ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আপন মনে বল্লেন,—"হায় তিন মাসের পথ আগ্রা! আর কি সেখান থেকে ফিরবো—আর কি যশোর দেখতে পাব!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ আগ্রায় এলেন। কত নদী পার হ'য়ে, কত ঝড়-তুফানে ডুবতে ডুবতে বেঁচে, কত ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে' প্রতাপের বিশখানা ডিঙ্গা আগ্রার ঘাটে লাগলো। তখন আকবর বাদশাহ সেখানে ছিলেন।

আগ্রা সহর মস্ত সহর। তার বড় বড় পথের ধারে বড় বড় বাড়ী—কোনটা দোতালা, কোনটা তেতালা, কোনটা চার-তালা। এক একটা দালান যেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সারি সারি পাথরের বাড়ী, তাদের মাথার উপর বড় বড় গোল গম্বুজ। গম্বুজের উপর নিশান উড়ছে। দূরে রাজপুরী —তার দুয়ারে দুয়ারে জোয়ান জোয়ান সিপাহী পাহারা দিচ্ছে। রোদ লেগে তাদের জরীর পোষাক ঝক্ ঝক্ করছে—হাতের তরোয়াল জ্বলে উঠছে। ঘোড়ায় চড়ে' সওয়ার যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো তালে তালে পা ফেলছে, যাচ্ছে লাফাচ্ছে—আবার ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রতাপ দেখলেন রাঙ্গা পাথরের মস্ত একটা গড়। সেই ৮০ হাত উঁচু গড়ের চারিদিকে ২০হাত চওড়া একটা খাল কাটা। যমুনা থেকে জল এনে সেই খাল ভরে' রেখেছে! গড়ের পূর্ব্ব দ্বারে পাথরের দুই হাতী দাড়িয়ে আছে—হাতীর উপর পাথরের মানুষ সওয়ার হয়েছে। দেখতে কেমন সুন্দর। প্রতাপ শুনলেন তিন কোটী টাকা খরচ করে' আকবর বাদশাহ এই গড় করেছেন। সে আজ কত দিনের কথা, যখন মথুরায় কংশ রাজা রাজত্ব করতেন তখন তিনি না কি এই আগ্রায় বন্দীদের বন্ধ করে' রাখতেন। তারপর ক্রমে ক্রমে আগ্রা সহর জঙ্গল হয়ে গেল।—শেষে একটা সামান্য গ্রাম হয়ে উঠলো।

সুলতান সেকেন্দর গাজি যখন দিল্লীর বাদশাহ হয়েছিলেন তখন তিনি আগ্রায় তাঁর রাজসভা করতেন। আগ্রা গ্রাম তখন আবার আগ্রা সহর হয়েছিল। বাদশাহ আকবর এসে সেখানে গড় তৈয়ারী করলেন। গড়ের মধ্যে সুন্দর সুন্দর পাঁচশ' বাড়ী হলো। নানাদেশের চিত্রকর এসে সেই সব বাড়ীতে কত ভাল

ভাল ছবি এঁকে দিলে। গড়ের চারিদিকে ২০হাত চওড়া মস্ত মস্ত প্রাচীর উঠলো। সেই প্রাচীরের উপর বড় বড় কামান গুলো মুখ হাঁ করে' পড়ে রইলো।

দেখতে দেখতে, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। প্রতাপ নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন। নদীর নাম যমুনা। যমুনার জল কালো, সেই কালো জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে —পাল তুলে পান্‌সী চলেছে। পাথরের বাঁধা ঘাটে অনেক নৌকা বাঁধা। সারি সারি সারি সারি কত নৌকা। নৌকার মধ্যে বাতি জ্বল্‌ছে। বাতাসে জল নড়ছে—নৌকা দুল্‌ছে—বাতি কাঁপছে—যমুনার কালো জল আলো লেগে ঝিকিমিকি ঝিকি করে' উঠছে।

এমন সময় দেব-মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজলো—মুসলমানের মস্‌জেদে আল্লার ধ্বনি হলো। প্রতাপ বল্লেন, "ভাই শঙ্কর! এমনি সন্ধ্যা কালে আমার যশোরেও এমনি করে' শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে। মা যশোর-দেবীর মন্দিরে এমনি করে' আরতি হয়। আর কি ভাই যশোরে ফিরে যেতে পারবো?" সূর্য্যকান্ত বল্লেন "ভাই প্রতাপ! আমরা ফিরবো বৈ কি। কিছু দিন এখানে থেকেই আবার সোণার যশোরে ফিরে যাব।"

এমনি করে' দিন গেল—মাস গেল। প্রতাপের সঙ্গে আগ্রার বড় বড় লোকের আলাপ পরিচয় হলো। তাঁর বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল। তিনি যেখানে যান সেখানেই তাঁর আদর।

প্রতাপ একদিন বাদশাহের দরবারে গেলেন। বাদশাহ

সিংহাসনে বসে' আছেন। মন্ত্রী সেনাপতি আমির ওমরাহ হাত যোড় করে' দাঁড়িয়ে আছেন। নানা দেশের রাজা মহারাজা কত সোণা-দানা ভেট এনে বাদশাহের জন্য অপেক্ষা করছেন। কত দেশের কত পণ্ডিত কত কবি সেখানে উপস্থিত। বাদশাহ যাঁর দিকে তাকাচ্ছেন তিনিই দুই হাতে সেলাম দিচ্ছেন। এমন সময় বাদশাহ বল্লেন—

"শ্বেত ভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ।"

সভা শুদ্ধ লোক নীরব। সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ আর কথা বলেন না। বাদশাহ বল্লেন "এ সভায় কি এমন কেউ নেই যিনি এই কবিতা মিলিয়ে দিতে পারেন।"

বাঙ্গালার প্রতাপ তখন বাদশাহকে সেলাম করে' বল্লেন—"জাঁহাপনা, হুকুম হয় ত আমি বলি।"

বাদশাহ মাথা নাড়লেন।

প্রতাপ আবার সেলাম করে' বল্লেন—

সো বর কামিনী নীর নাহারতি
রিত ভালি হেঁ
চির মচরকে গচপর বাবিকে
ধারেছ চল্ল চলি হেঁ।
রায় বেচারি আপন মনমে
উপমা ও চারিহে।
কে ছন্দ মারোরতি শ্বেত ভুজঙ্গিনী
যাত চলি হেঁ।

বাদশাহ ধন্য ধন্য করে' উঠলেন। সে দিনের মত সভা ভঙ্গ হ'লো। বাদশাহের কাছে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রতাপ বিদায় হলেন। আগ্রার লোকের মুখে মুখে প্রতাপের নাম ফিরতে লাগলো।

প্রতাপের বুদ্ধি ও প্রতাপের বিদ্যা দেখে বাদশাহ ক্রমেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট হতে লাগলেন। শেষে একদিন তাঁর নামেই যশোরের রাজত্ব লিখে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাইশ হাজার সৈন্যের হুকুম দিলেন। সসম্মানে প্রতাপ বিদায় হ'লেন।

আবার ডিঙ্গা সাজলো। লোক জন সব উঠলো। আগ্রার কত নূতন নূতন জিনিষ-পত্র বোঝাই হ'লো। 'জয় মা যশোরে-শ্বরী' বলে' প্রতাপ নৌকা ছাড়লেন। আনন্দে বন্ধুর গলা ধরে বল্লেন, "আমি ভিখারীর মত আগ্রায় এসেছিলাম, রাজা হয়ে ফিরছি। এখানে গড়-গম্বুজ কামান-বন্দুক যেমন দেখলেম, আমার যশোরেও তেমনি তৈয়ারী করবো।"

পানসীর পালে বাতাস্ লাগলো। কালো জলে ঢেউ উঠলো। রাজার ছেলে প্রতাপ রাজা হ'য়ে যশোরে চল্লেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ রাজা হ'য়ে যশোরে এলেন। এসেই পিতার চরণে প্রণাম করে' বল্লেন, "বাবা, আপনিই যশোরের রাজা। আমি ত আপনার দাস।"

সত্যই তাই হ'লো। বুড়ো রাজাই সিংহাসনে বসে রাজকার্য্য করতে লাগলেন।

প্রতাপ যশোরকে সাজাতে আরম্ভ করলেন। বন-জঙ্গল কাটা হ'লো। বড় বড় দীঘি ভাল ভাল পুকুর জলে টল টল করতে লাগলো। যে বনে বাঘ ডাকতো শূকর খেলতো সে বনের একটা গাছও আর থাকলো না। যশোরের নূতন নূতন প্রজারা সেখানে লাঙ্গল চ'ষে সোণার ধানের আবাদ করলে।

প্রতাপ যে শুধু যশোর নিয়েই থাকলেন, তা নয়। তিনি ভাবলেন, আমি বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে জন্মেছি। সমস্ত দেশটার যাতে ভালো হয় তাই ত আমার করা উচিত।

একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রতাপকে আর রাজা বসন্ত-রায়কে ডেকে বল্লেন, "আমি বুড়ো হয়েছি—আর ক'দিনই বা বাঁচবো; আমি বেঁচে থাকতেই যশোরকে দুই ভাগ করে' তোমাদের দুজনকে দিয়ে যাই।" যশোর রাজ্য তখন মস্ত ছিল। তার পূর্ব্বদিকে ছিল মধুমতী নদী, আর পশ্চিমে ছিল গঙ্গা। রাজ্যের পূর্ব্বদিক প্রতাপের, আর পশ্চিম দিক রাজা বসন্তরায়ের ভাগে পড়লো।

বুড়ো মহারাজ আর বেশী দিন বাঁচলেন না। তখন প্রতাপের নূতন রাজধানী ধূমঘাট তৈয়ারী হ'চ্ছিল। ঘন বন—দিনেও কেউ সেখানে যেত না। প্রতাপ সেই বন কাটিয়ে নগর করলেন। নগরও যেমন মস্ত, প্রাচীরও তেমনি উঁচু। সেই ত্রিশ হাত উঁচু প্রাচীরের মাথার উপর প্রতাপের সিপাহী অস্ত্র হাতে করে' ঘুরে বেড়াতো। নগরে চা'লের হাট, ধানের হাট। কাঁসার হাটে থালা ঘটী বাটী, কাপড়ের হাটে কাপড়। একদিকে পাটনা মালদহ মুর্শিদবাদের রেশম, আর একদিকে ঢাকার মসলিন। এখানে সোণা রূপার বাসন, সেখানে হীরা মতি মাণিক। এক হাটে হাতী ঘোড়া উট, আর একদিকে ভেড়া ছাগল পাঁঠা। কেউ ডাকছে 'ভ্যা'—কেউ করছে 'ম্যা'। হাজার খাঁচায় হাজার পাখী—নাচ্‌ছে খাচ্ছে কিঁচ্-মিচ্ কচ্ছে। হাজার দোকানে হাজার লোক। কেউ দেখ্‌চে, কেউ কিনছে, কেউ চুরি করার ফন্দীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাজারের পরই চারিদিকে চারটী পুকুর। পুকুরের জল বড় ঠাণ্ডা—বড় পরিষ্কার—ঠিক যেন আয়না। কত রাজহংস সেই জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। পুকুর ঘেরা বাগান। বাগানে ফুল ফুটেছে—চাঁপা মল্লিকা মালতী টগর। কামিনী ফুলের গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়ে এসে বসছে, মধু নিচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে।

দিনে দিনে মাসে মাসে ধূমঘাট সেজে উঠলো। সে যেন

একখানা ছবি। কিছুদিন যায় যায় যায়—প্রতাপ ভাব্‌লেন, আমি যে এই এত বড় বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করতে চাই—বাঙ্গালা থেকে মোগল আর পাঠানকে তাড়িয়ে দিতে চাই — সময় হ'লে এ সব পারবো কি না একবার বুঝে দেখতে হয়।

তখন তিন বন্ধুতে পরামর্শ করে' অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে উড়িষ্যা দেশে রওনা হলেন।

ইংরাজ রাজা এখন ভারতবর্ষকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি নানা ভাগে ভাগ করে' দিয়েছেন। আকবর বাদশাহও তেমনি তাঁর রাজ্য প্রথমে এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহম্মদাবাদ, বেহার, বাঙ্গালা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান, আর মালব এই কয়টা ভাগে ভাগ করেছিলেন। নূতন রাজ্য জয় হলে পর এই বার ভাগ পনের ভাগ দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক ভাগ এক একজন কর্ত্তার অধীনে থাকতো। তাঁদের বল্‌তো সুবাদার।

উড়িষ্যা দেশ তখন বাঙ্গালার মধ্যে ছিল। প্রতাপ উড়িষ্যা যাত্রা করলেন। উড়িষ্যার পথে কটক নগর। সেখানে ধূসরবর্ণ পাথরের মস্ত একটা গড়ের মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের প্রকাণ্ড নয়তালা বাড়ী ছিল। তার সকলের নীচ তালায় হাতী-ঘোড়া-উট আর সকলের উপর তালায় রাজা থাকতেন। মধ্যে থাকতো দাস-দাসী, সিপাহী-প্রহরী, অস্ত্র-শস্ত্র।

উড়িষ্যার আর এক নাম উৎকল। উৎকল দেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল। তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা

ব্যয় করে' এমন সুন্দর সুন্দর মন্দির, সুন্দর সুন্দর রাজবাড়ী প্রস্তুত করেছিলেন যে দেখলে অবাক হ'তে হয়। উৎকলের যিনি রাজা ছিলেন তাঁর অধীনে আবার অনেক ছোট ছোট রাজা থাকতেন। তাঁদের বল্‌তো সামন্ত। দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হলেই তাঁরা লোক দিয়ে, টাকা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে রাজার আজ্ঞা পালন করতেন।

এখন যেখানে মস্ত মাঠ—মাঠ ভরা ধান—একদিন হয় ত সেখানে মস্ত একটা গ্রাম ছিল্‌। গ্রামে জোয়ান জোয়ান লোক বাস করতো। রাজার আজ্ঞা পেলেই অমনি দশ হাতিয়ার বেঁধে যুদ্ধ করতে ছুটতো। ঐ যে দেখা যায় ঘন বন—বড় বড় গাছ চারিদিক ডাল পালা ছড়িয়ে রাক্ষসের মত দাঁড়িয়ে আছে, ঐখানে হয় ত একদিন কত যুদ্ধ হয়েছে—যুদ্ধ জয় করে, ঐ পথে উৎকলের হিন্দুরাজার হিন্দু সেনাপতি বাঁশী বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে জয় জয় রবে ধেয়ে গিয়েছেন।

ওই দূরে দূরে মেঘের মত পাহাড় মেঘে পাহাড়ে মেশা মিশি। স্থানে স্থানে নিবিড় বন—বনের পাশে আঁকা বাঁকা পথ—কোন্ দূর দেশে চলে গেছে। কোথাও বা বড় বড় নদী; কোন খানে প্রকাণ্ড লম্বা সেতু—তার তলা দিয়ে হু হু করে' জলের স্রোত ছুটে চলেছে। পাথরের সেতু। সেই পাথর কেটে পালিশ করে' কত ছবি খোদাই করা! দেখতে দেখতে প্রতাপ যাজপুর পার হয়ে ভুবনেশ্বরের নিকটে এলেন। এই যাজপুরেই না কি স্বয়ং ব্রহ্মা এসে একবার যজ্ঞ করেছিলেন।

গাছের মাথার উপর দিয়ে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। যে দিকে চোখ যায় সেই দিকেই পাথরে গাঁথা ছোট-বড় অসংখ্য মন্দির আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের গায়ে কত লতা কত ফুল, কত পাতা কত ফল খোদাই করা। আলো লেগে ঠিক যেন আসলটির মত দেখাচ্ছে। আরও বা কত পুরুষ কত নারী, কত পশু কত পক্ষী জীবন্তের মত মন্দিরের গায়ে ফুটে রয়েছে। রমণীর হাতের বালা কানের দুল পর্য্যন্ত ঝক্ ঝক্ করছে।

ওই যে পাহারার মত শৈলশ্রেণী দেখা যায় ওরই নাম খণ্ডগিরি। পাহাড়ের উত্তর অংশের নাম উদয়গিরি, দক্ষিণ অংশের নাম নীলাগিরি। আহা এমন সুন্দর করে' পাথর খুঁড়ে' কে এখানে ঘর করেছে? ঘরের দেয়ালে এত যত্ন করে' কত দিনের কত পুরোনো কথা কে এমন করে' লিখে গেছে। সে ঘর পাথরের থামের উপর আজও গর্ব্ব করে' দাঁড়িয়ে আছে— সে লেখা আজও যেন নূতনের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। আমরা ঘরকে বলি গুহা বা গুম্ফা আর লেখাকে বলি শিলালিপি।

এই বুঝি উদয়গিরির রাণীগুম্ফা! কি সুন্দর! ওই যে অস্ত্র শস্ত্র পরে' মাথায় তাজ বেঁধে, কাঁকালে ধারাল তরোয়াল নিয়ে পাথরে গড়া একটা সৈনিক পুরুষ পাথরে গড়া ঘোড়ায় চড়ে' বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা দুইটা তিনটা—ওই যে আর একটা, ওই যে আরও একটা। এ কি! এখানে

এত গুহা, আর গুহার গায়ে এত লেখা!—গুহার দেওয়াল কি সুন্দর পালিশ করা। ওই যে পাথরের ফুলের মালা গলায় দিয়ে পাথরের অলঙ্কারে সাজিয়ে কত নারীমূর্ত্তি কে যেন পাথর কেটে গড়ে' রেখেছে! ওই যে আবার পুরুষের ছবি! কি গম্ভীর মুখ! মুখ দেখলে মনে হয় যেন মস্ত একটা বীর, অথচ সে মুখখানি কেমন সুন্দর কত কোমল। মনে হয় যেন যার এ মুখ, তার বুকভরা ভালবাসা আছে। সে নির্দ্দয় নয়।

ওই যে, ওটা আবার কি? এ যে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের অনুশাসনলিপি! অযোধ্যায় যেমন রামরাজা—তেমনি পাটলি-পুত্রে একজন রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল অশোক! কি নিয়মে দেশ শাসন করতে হবে, প্রজাদের সুখ-সুবিধা করে' দিতে হবে মহারাজ অশোক তাঁর রাজ্যের মধ্যে নানা স্থানে সেই সব আদেশ পাথরের গায়ে লিখে রেখেছিলেন। তাকেই বলে অশোকের অনুশাসনলিপি।

সে পর্ব্বতের শিখরে উঠলে কি সুন্দর শোভাই দেখা যায়! সারি সারি তালের গাছ—যতদুর চক্ষু চলে ততদূর চলে গেছে। ওই দূরে একটা নদী রূপার পাতের মত ঘুরে ফিরে বয়ে চলেছে। কোন পাহাড়ের গায়ে সেকালের মঠ-মন্দিরের ভাঙ্গা পাথর ভাঙ্গা ছবি পড়ে' আছে। একদিন এ সব কত আদরের জিনিষ ছিল। আজ তাদের এই দশা দেখে কা'র চোখে না জল আসে।

প্রতাপ ধীরে ধীরে লোক জন নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। যেতে যেতে যেতে হঠাৎ মেঘগর্জ্জনের মত গর্জ্জন শুনে চমকে উঠলেন। কিছুদূর এগিয়েই দেখেন যতদূর দেখা যায় কেবল জল—নীল জল। নীল জল কাঁপে দোলে বড় বড় ঢেউ তোলে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা সাদা ফেনা, একটার পর একটা করে' যখন ঢেউ গুলো এসে মাটির গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে তখন বুম্ বুম্ করে শব্দ হয়।

সেই অতবড় সমুদ্রের কাছে জগন্নাথদেবের অতবড় মন্দির। সে মন্দির পাথরে গাঁথা! মন্দিরের গায়ে কত থাম, কত কার্ণিশ, কত কুলুঙ্গি! আর সেই সব কুলুঙ্গির মধ্যে পাথরে গড়া কত বড় বড় মূর্ত্তি। সেকালে আমাদের দেশে যে সব রাজমিস্ত্রী ছিল তারাই সে মন্দির গড়েছিল! এখন কি আর কারো সাধ্য আছে যে তেমন্ পারে! ঘাড় ভেঙ্গে তাকালে তবে যে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়, প্রতাপ অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলেন সেই চূড়ার উপর অত ভারি পাথর কেমন করে' উঠলো! হায়, আর কি সেদিন ফিরে আসবে—যে দিন আমাদের দেশের কারিকরে আবার এমন একটা মন্দির গড়তে পারবে!

প্রতাপ মন্দিরের মধ্যে গেলেন। অন্ধকার ঘর। সেই ঘরের মধ্যে এক-মানুষ উঁচু পাথরের বেদী আর বেদীর উপর মাঝে সুভদ্রাকে নিয়ে জগন্নাথ ও বলরাম ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'পাশে দু'টো বড় বড় বাতি জ্বল্‌ছে। সে বাতি দিনেও জ্বলে রাতেও জ্বলে। মন্দিরে খোল-করতাল

বাজিয়ে গান হচ্ছে। ভক্তেরা ঘরের মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে' প্রণাম কচ্ছে। দিনে রাত্রে বায়ান্ন বার ভোগ হচ্ছে। ভারে ভারে ভোগ আস্‌ছে, আবার আনন্দবাজারে বিক্রী হচ্ছে। ভাত ডাল তরকারী—সেখানে সব কিন্‌তে পাওয়া যায়। পুরীর মধ্যে বামুন কায়েত নাই—সব হিন্দুই সমান। প্রতাপের নকর চাকরেরা প্রসাদ কিন্‌তে গেল। প্রতাপ দুই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখতে লাগলেন।

ঐই পুরীর কাছেই কোনারকে সূর্য্যমন্দির ছিল। বিরাট সমুদ্রের তীরে বিশাল মন্দির। অত বড় অমন সুন্দর মন্দির বুঝি সে কালে আর ছিল না। সাড়ে ২৭ কোটী টাকা খরচ করে' এই আশ্চর্য্য মন্দির প্রস্তুত হয়েছিল! মন্দিরে প্রবেশ করার তিনটী সিংহদ্বার অতি সুন্দর করে' সাজানো। পাথরের প্রকাণ্ড দুটো হাতী দুয়ারের দু'পাশে দাঁড়িয়ে শুঁড়ের উপর দু'জন মানুষকে তুলে ধরেছে। আর একস্থানে দুয়ারের মাথায় দুটো সিংহ একটা হাতীকে মেরে গর্ব্ব করে তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিংহও পাথরের—হাতীও পাথরের। তোমরা শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে যে এই বাঙ্গালা দেশের মিস্ত্রী গিয়ে সেই বিরাট মন্দির তৈয়ারী করেছিল। পাঁচশ' মণ ওজনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর তুলে' যারা অনায়াসে সেই মন্দিরের চূড়ায় বসিয়েছিল তারা আমাদেরই মত বাঙ্গালী! সেকালে ১৫০ হাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে মন্দিরটী ঘেরা ছিল। আরো একটা আশ্চর্য্য কথা শোন। যে পাথর দিয়ে সেই বিশ্ববিখ্যাত মন্দির প্রস্তুত

হয়েছিল সে পাথরের খনি কোনারকের ৪০ ক্রোশের মধ্যে কোথাও নাই! তখন ত এখনকার মত রেল ছিল না, কলের জাহাজ ছিল না। তবে সে সব পাথর এসেছিল কেমন করে'! আজকাল তোমরা কত কল কবজা দেখছো--কত বড় বড় বাড়ী দেখছো। যে ইংরাজ সে সব বাড়ী নির্ম্মাণ করছেন, তাঁরা পর্য্যন্ত কোনারকের মন্দির দেখে অবাক হয়ে গেছেন!

মন্দিরের মধ্যে সূর্য্যদেবের পাথরে গড়া বিরাট একটা মূর্ত্তি ছিল। তিনি রথে বসে' আছেন - সাতটা ঘোড়ায় সেই রথ টেনে নিয়ে যাচ্চে। সূর্য্যদেবের মাথায় মুকুট, কাণে কুণ্ডল, কোমরে তরোয়াল, হাতে রক্তপদ্ম। পায়ের নীচে অরুণ বসে আছেন। কেউ বা লেখনী হাতে কেউ বা ধনুর্ব্বাণ নিয়ে দু'পাশে শোভা পাচ্ছে। জনহীন সমুদ্রের তীরে এখনো সেই ভাঙ্গা মন্দিরে কত শক্ত লম্বা কালো পাথর পড়ে আছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েকদিন চলে' গেল। প্রতাপ গোপনে উড়িষ্যার সব অবস্থা জেনে নিতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সৈন্য অল্প, অস্ত্র-শস্ত্র অল্প। কিন্তু সাহস তাঁর খুব বেশী ছিল। সেই সাহসে ভর করে' তিনি একদিন পুরীর গোবিন্দদেব ও উৎকলেশ্বর শিব তুলে' নিলেন! উড়িষ্যার হিন্দুরাজারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রতাপকে ঘিরে ধরলেন। দুইদলে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রতাপ যুদ্ধ করতে করতে বল্লেন, "ভাই শঙ্কর! এ যুদ্ধে যদি হারি তা' হ'লে যশোরে মুখ দেখাতে পারবো না। বল "জয় যশোরদেবীর জয়।" যশোর দেবীর নামে শঙ্কর আর সূর্য্যকান্তের

বুকে সাহস হ'লো। তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শেষে প্রতাপেরই জয় হ'লো। তিনি বাজনা বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে বাঙ্গালার জয়গান করতে করতে যশোরে ফিরে এলেন।

যশোরের লোক আনন্দে মত্ত হ'য়ে উঠলো। গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গলঘট বসলো। রাজপথে ফুলের মালা বাঁধা হ'লো। সৈন্যগণ গড়ের মধ্যে কোলাহল করতে লাগলো। কামানের শব্দে লোকের কাণে তালা লাগলো।

রাজা বসন্তরায়ের পায়ে প্রণাম করে' প্রতাপ বল্লেন, "কাকা, আপনার জন্য শিব এনেছি।" বসন্তরায় প্রতাপকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন।

তখন ব্রাহ্মণ এলেন, পণ্ডিত এলেন—কত দেশের পুরোহিত এলেন। যাগ-যজ্ঞ-হোম হলো। সকলে পুরীর দেবতা দু'টীকে যশোরে স্থাপিত করলেন। রাজা বসন্তরায় দুই হাতে টাকা ঢেলে দিয়ে বল্লেন, "খুব ভালো মন্দির তৈয়ারী কর। যত টাকা লাগে আমি দিব।"

এখনো যশোরের গোপালপুর গ্রামে গেলে সেই সুন্দর মন্দিরের ভাঙ্গা ইঁট দেখতে পাওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একাল দিয়ে সেকাল দেখা যায় না। এখন ইংরাজের আমল। এখন কত সুখ কত সুবিধা। চোর ডাকাতের ভয় নাই, যাতায়াতের দুঃখ নাই! কেউ কারো উপর অত্যাচার করতে সাহস পায় না। এখন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, নগরে নগরে স্কুল। যার ইচ্ছা লেখা পড়া শিখে মানুষ হয়। সেকালে কি এমনি ছিল?

সেকালে পাড়াগাঁয়ে একদল মণ্ডল থাকতো। সে কাণে কুণ্ডল দিয়ে রাজদরবারে যেত। কথাতেই বলে—"কোনাই মণ্ডল, কাণে কুণ্ডল, নাও বরাবর সিঁতি।" তাদের কথাতেই কারো সর্ব্বনাশ হতো, কারো বা সুখের সীমা থাকতো না। তখন কি আর নিরাপদে রাজপথে বেড়াবার উপায় ছিল? ছদ্মবেশে ফাঁসুড়েরা ঘুরে বেড়াতো—সুবিধা পেলেই গলায় ফাঁসি লাগিয়ে প্রাণ বধ করতো। ছেলেধরায় অনায়াসে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করে' নিয়ে যেত। চোর ডাকাতের ভয় ত ছিলই। মোগল আর পাঠানে বিবাদ লেগেই ছিল। তারা আবার নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করতো। তাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিত, যথাসর্ব্বস্ব লুঠে নিত, দেবতার মন্দির ভেঙ্গে দিত। সুবাদার নিজের আরাম নিয়েই সিংহাসনে বসে থাকতেন। সকল সময় দেশের খোঁজ-খবর বড় একটা রাখতেন না। বাদশাহের ত

কথাই নাই। এখন যেমন বিলাত থেকে আমাদের দয়াল রাজা দয়াল রাণী এসে আমাদের অবস্থা দেখে যান, তখন কি আর তাই হ'তো? তবে তখন খাবার জিনিষের দাম সস্তা ছিল, তাতেই লোকের যা' একটু সুবিধা হ'তো।

তখন ছেলেরা ব্যাটবল, ফুটবলের নামও শোনেনি। তারা কড়ি খেল্‌তো, কোড়ভেট খেলতো—কেউ বা ঘরচালি পাতিখেলা ঝালিখেলা নিয়েই থাক্‌তো। যাদের বয়স হয়েছিল তারা পাশা খেল্‌তো—আর কেউ বা হাতে সোণার মাদুলি বেঁধে পায়রার লড়াই করতো। হিন্দুর মেয়েরা এখনকার মত তখনো নানা রকম ব্রত করতেন। চারিদিকে অত্যাচার অবিচার উপদ্রব ছিল বলে' আবশ্যক হ'লে অনেক লোকে যুদ্ধ করতে যেতেন। তাই মেয়েরাও ব্রতের ছড়ায় বল্‌তেন—

"পাকা পান মত্তমান্
আমার স্বামী নারায়ণ।
যখন যাবেন রণে,
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে॥"

প্রতাপ ভাবতে লাগলেন কি করলে বাঙ্গালী প্রজার দুঃখ যায়—তারা মোগল-পাঠানের হাত থেকে রক্ষা পায়। কি করলেই বা বাঙ্গালার বল বাড়ে। ভাবতে ভাবতে প্রতাপ একদিন ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রতাপের দুঃখ দেখে যশোর-দেবীর দয়া হ'লো। তিনি প্রতাপকে স্বপ্নে বল্লেন,—"প্রতাপ, তোমার রাজ্যের নানা স্থানে ভাল ভাল গড় তৈয়ারী

কর—তোমার সৈন্য বাড়াও। বাঙ্গালী যাতে বাঙ্গালাকে ভালবাসে তার চেষ্টা কর। কখন অধর্ম্ম ক'রো না। যতদিন ধর্ম্মপথে থাকবে, আমি ততদিন তোমার সহায়।" প্রতাপ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন—উদ্দেশে দেবীকে প্রণাম করলেন।

বাঙ্গালার প্রতাপ উড়িষ্যা জয় করেছেন এ কথা তখন কে না জানতো? যশোরদেবী স্বয়ং প্রতাপকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন শুনে' বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল! হাল ছেড়ে হেলে এল, চাষ ছেড়ে চাষী এল। বাঙ্গালার হিন্দু বাঙ্গালার মুসলমান 'জয় বাঙ্গালার জয়' বলতে বলতে এসে প্রতাপের সৈন্য হ'তে লাগলো। বাঙ্গালার জমীদারেরা একে একে প্রতাপের অধীন হতে লাগলেন। রাঢ় দেশের রাজারা পর্য্যন্ত যশোরের প্রজা হ'লেন। দিন যায়, মাস যায়—প্রতাপের টাকা বাড়তে লাগলো, সৈন্য বাড়তে লাগলো, বল বাড়তে লাগলো।

প্রতাপ যখন দেখলেন বাঙ্গালার বল অনেক বেড়েছে তখন শঙ্করকে ডেকে বল্লেন, "শঙ্কর, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এ তিন দেশের রাজা মহারাজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র কায়স্থ সকলকে নিমন্ত্রণ কর। তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমি রাজদণ্ড হাতে করবো।"

অতিথিদের থাকার বাসা প্রস্তুত হতে লাগলো। ভারে ভারে মিঠাই-মিষ্টান্ন এলো, ফলে মূলে বড় বড় ঘর ভরে উঠলো। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অভিষেক। তখনো তার

১১।১২ দিন বাকি। দলে দলে ভাট এল—হাজার হাজার ফকির-বৈষ্ণব এল—কাঙ্গালী যে কত এলো তার লেখা-যোঁখাই নাই। কত রাজা এলেন, মহারাজা এলেন। তাঁদের লোক-জন, হাতী-ঘোড়া এসে ধূমঘাট পূর্ণ হ'লো।

সকাল হতে না হতেই ভাল ভাল বাজনদারেরা মিষ্ট মিষ্ট গান বাজাতে লাগলো। হাজার লোকে যশোর-দেবীর জয়নাদ করলে। মেয়েরা লাল নীল গোলাপী হলুদ নানা রংয়ের রেশমী সাড়ী পরে' গহনায় সেজে আল্‌তা পায়ে হুলাহুলি করতে লাগলো। বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুঁথি খুলে' মন্ত্র পড়ে' নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধালেন। কোথাও পূজা হতে লাগলো—কোথাও বা হোমের আগুন জ্বলে' উঠলো। কোন খানে শঙ্খ বাজে, কেউ ঘণ্টা নাড়ে। ঢুলিরা ঢোল বাজায়, যশোরদেবীর মন্দিরে হাজার ঢাকী ঢাকে কাঠি দেয়। গড়ের মধ্যে জয়ঢাক, বীরঢাক, কাড়া, পড়া, দামামা, দগড় কত বাজে। চারিদিকে হৈ হৈ, চারিদিকে গণ্ডগোল!

এমন সময় গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মন্ত্র পড়ে' প্রতাপের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি হ'তে লাগলো। ডঙ্কা পড়লো—বন্দুকের শব্দে যশোর কাঁপলো!

প্রতাপ মনে মনে যশোরদেবীকে প্রণাম করলেন; তারপর সোণার সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড হাতে নিলেন। দাসীরা চামর দিয়ে বাতাস দিতে লাগলো। কেউ বা সোণার

ছাতি প্রতাপের মাথায় ধরলো। ব্রাহ্মণ শঙ্কর প্রতাপের হাতে তরোয়াল তুলে দিলেন। লক্ষ লোক গর্জ্জন করে' উঠলো "জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।"

মহারাজের পাশে এসে মহারাণী বসলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো। যে যা' ভিক্ষা চাইল, তাঁরা তাই দান করতে লাগলেন। প্রতাপ বল্লেন, 'আজ আমারি ভাণ্ডার মুক্ত, যে যা' চাবে, সাধ্য হলে আমি তাই দেব।"

এক ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে এসে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করে' বল্লেন,—

"আমার একটা ভিক্ষা আছে।"

প্রতাপ। আদেশ করুন।

ব্রাহ্মণ। অভয় দিলে বলতে পারি।

প্রতাপ বল্লেন, "আপনার ভয় কি!" নির্ভয়ে বলুন।

ব্রাহ্মণ। আমি মহারাণীকেই ভিক্ষা চাই!

কি সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণ মহারাণীকেই ভিক্ষা চান! সভার লোক চমকে উঠলো। বাদ্য-ভাণ্ড থেমে গেল। কামান-বন্দুক নীরব হলো। কারো মুখে আর কথা নাই। সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণ যে মহারাণীকেই চান!

মহারাজ প্রতাপাদিত্য হেসে বল্লেন,—"ব্রাহ্মণ! আপনি আমার অতিথি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আজ যে যা' চাবে আমি তাকে সাধ্য হলে' তাই দেব। আমার কথা নড়বে না।" ব্রাহ্মণ বল্লেন, "মহারাজের জয় হোক্।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহারাণীর মুখ শুকিয়েছে—চোখ ছল ছল করছে। তিনি মনে মনে যশোর-দেবীকে ভাবতে লাগলেন।

প্রতাপ বল্লেন, "মহারাণি! আজ আমরা দু'জনে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখো যেন তা' ভাঙ্গে না। ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দাও মহা-রাণি! লোকে যেন না বলে যশোরের রাজা মিথ্যাবাদী।"

যশোরদেবীকে ডেকে মহারাণীর মনে সাহস হ'লো। তিনি বল্লেন, "মহারাজ! তুমি আমার স্বামী। আমার দেবতাই তুমি। আমি যদি সতী হই তবে কখনো তোমার কলঙ্ক হ'বে না। আজ থেকে তোমার মহারাণী ঐ ব্রাহ্মণেরই দাসী হ'বে।"

সেই লক্ষ লোকের সভায় তখন 'ধন্য ধন্য' রব উঠলো। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আনন্দে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দুই হাত তুলে' আশীর্ব্বাদ করে' মহারাণীকে বল্লেন "মা তুমি সতী লক্ষ্মী। যশোরের দেবী তুমি। আমার অপরাধ নিও না মা। আমি আজ মহারাজের মন পরীক্ষা করছিলাম। আজ সত্য সত্যই বুঝিলাম—

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে
প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনী মণ্ডলে।"

চারিদিকে আবার জয়ধ্বনি হতে লাগলো। ঢুলি আবার ঢোল বাজালে, ঢাকার ঢাকে কাঠি পড়লো। নহবৎখানায় পোঁ পোঁ করে শানাই বেজে উঠলো।

প্রতাপ বল্লেন, "যত টাকা লাগে নাও, সোণা দিয়ে মহারাণীর মূর্ত্তি গড়ে' ব্রাহ্মণকে দাও।" সে দিনের মত সভা ভঙ্গ হলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ রাজা হলেন কিন্তু বন্ধু শঙ্কর আর সূর্য্যকান্তকে ভুললেন না। শঙ্কর প্রতাপকে বুদ্ধি দেন, পরামর্শ দেন। সূর্য্যকান্ত তাঁকে সাহস দেন, আর দু'জনে মিলে যশোরের সৈন্যদের তীর চালাতে, বন্দুক চালাতে শেখান।

বাঙ্গালার সুবাদার আজিম খাঁ তখন গৌড়ে থাকতেন। তাঁর দূত এসে বল্লে, "জাঁহাপনা! যশোরের ভূঁইয়া প্রতাপ খাজানা বন্ধ করেছেন!"

আজিম আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, "খাজানা বন্ধ করেছেন! কেন?" হাত যোড় করে দূত বল্লে, "খোদাবন্দ! প্রতাপ এখন রাজা হয়েছেন। তিনি এখন দিন দিন সৈন্য আন্‌ছেন, গড় তৈয়ারী করছেন। আর সুবিধা পেলেই মোগলদের উপর উপদ্রব করতে ছাড়্‌ছেন না!"

আজিম। রাজা বসন্তরায় কি তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন?

দূত। না, জাঁহাপনা! তিনি আপনার গোলামের গোলাম। তিনি যখন প্রতাপকে বল্‌লেন, 'প্রতাপ, তোমার কুবুদ্ধি ছাড়, প্রতাপ তখন রাগ করলেন। কাকার সঙ্গে তাঁর আর মনের মিল নাই।

রাগে বাঙ্গালার সুবাদারের দুই চোখ লাল হয়ে উঠলো। সভা শুদ্ধ লোক নীরব—আজ না জানি কি হয়! অমনি এক মোগল সেনাপতির ডাক পড়লো। আজিম খাঁ বল্‌লেন,

"যেমন করেই হোক্ প্রতাপকে বেঁধে এই রাজসভায় আনতে হবে।"

প্রতাপ শুনলেন আজিম খাঁর সেনাপতি সৈন্য নিয়ে আসছেন। প্রতাপও সাজতে লাগলেন।

যশোরের কাছেই মৌতলা। মৌতলায় প্রতাপের সঙ্গে মোগলসৈন্যের দেখা হ'লো। অমনি দুই দলে যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধে ঘোড়া মলো, ঘোড়ার তলে মানুষ পড়লো, হাতীগুলো ক্ষেপে উঠে যে দিক সে দিক পালাতে লাগলো। মোগল সৈন্যেরা কেউ বনে, কেউ ঝোপে, কেউ নদীর জলে ডুব দিয়ে প্রাণ বাঁচালো! প্রতাপের বর্শা লেগে মোগল সেনাপতি ঘোড়া সমেত পড়ে' গেলেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘোড়াও মলো, তিনিও মরে গেলেন! যুদ্ধে প্রতাপের জয় হ'লো!

হাস্‌তে হাস্‌তে নাচতে নাচ্‌তে প্রতাপের সৈন্য ফিরে এল। যশোরদেবীর মন্দিরে হাজার ঢাক বাজতে লাগলো। প্রতাপ তাঁর রক্তমাখা তরোয়ালখানা মন্দিরের দুয়ারে রেখে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। সকলে জয়ধ্বনি করে উঠলো।

দেখতে না দেখতে গৌড়ে সংবাদ গেল, মোগল সেনাপতি কাটা পড়েছেন—মোগল-সৈন্য পালিয়ে এসেছে। সুবাদার আজিম খাঁ সিংহাসনে বসেছিলেন; লাফিয়ে উঠলেন "কি! মোগলসেনাপতি কাটা পড়েছেন। কে কোথায় আছ সাজ। আমি নিজেই যুদ্ধে যাব।"

গৌড়ে সাজ্ সাজ্ রব উঠলো। মোগল-সৈন্য তাদের অস্ত্র

গুলো ধার দিতে লাগলো। গড়ের মধ্যে তুরী বাজলো ভেরী বাজলো, ডঙ্কার পিঠে ঘন ঘন কাটি পড়লো। সুবাদার আজ নিজেই যুদ্ধে যাবেন !

'আল্লা হো আকবর' বলে' মোগল সৈন্য বাহির হ'লো। কেউ ঘোড়ায় কেউ হাতীর পিঠে কেউ বা পায়ে হেঁটে,—সারি সারি সারি সারি মোগল-সৈন্য চল্‌তে লাগলো। নৌকায় নিশান উড়লো, অস্ত্র উঠলো, ভাল ভাল কামান-বন্দুক তোলা হ'লো। কতক সৈন্য জলপথে যেতে লাগলো। সঙ্গে গেলেন বাঙ্গালী সেনাপতি ভবেশ্বর রায়।

প্রতাপ নূতন নূতন সৈন্য নিতে লাগলেন। তারা তখন অস্ত্র ধরতেই শেখেনি ! প্রতাপ পালিয়ে যাবার লোক ছিলেন না। সেই অশিক্ষিত সৈন্য নিয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর হাতী ঘোড়া সৈন্য মরে গেল, কিন্তু যুদ্ধে জয় হ'লো না।

প্রতাপ যুদ্ধে পরাস্ত হ'লেন, কিন্তু কোন দুঃখ করলেন না। আবার নূতন উৎসাহে সৈন্যদের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন।

বাঙ্গালী সেনাপতি ভবেশ্বর রায়ের বীরপণায় তুষ্ট হ'য়ে আজিম খাঁ প্রতাপের রাজ্য থেকে কয়েকটা গ্রাম কেড়ে নিয়ে তাঁকে পুরস্কার দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

শত্রু যাতে আর যশোরে না আসতে পারে প্রতাপ তখন তাই করতে লাগলেন। নদীর মুখে, পথের ধারে, বনের আড়ালে প্রতাপের গড় তৈয়ার হ'তে লাগলো। প্রাচীর দিয়ে গড় ঘেরা। তার চারিদিকে খাল। খালে অগাধ জল। ধীরে ধীরে প্রতাপের গড় হ'তে লাগলো। রায়গড়, মৌতলা, শালিখা, জগদ্দল, কমলপুর, প্রতাপনগর কত স্থানে প্রতাপের গড় হ'লো। গড়ের মধ্যে বন্দুক কামান, গুলি গোলা, তীর তরোয়াল, বল্লম বর্শা জমা হ'তে লাগলো। ভাল ভাল 'ব্যারাক' তৈয়ার হ'লো। সেখানে সৈন্য থাকে—মাঠে তীর চালায়, তরোয়াল খেলে, বন্দুকের নিশানা করে। সে মাঠকে লোকে এখনো কুশলী ক্ষেত্র বলে।

যেমন প্রতাপের গড় প্রস্তুত হ'তে লাগলো, তেমনি নানা স্থানের লোক এসে তাঁর সৈন্য হ'লো। বাঙ্গালার বীর মদনমাল ঢালীদের কর্ত্তা হ'লেন, প্রতাপদত্ত রথীর ভার নিলেন, রঘুর অধীনে ঢাকা অঞ্চলে সৈন্য থাকলো আর সুখা থাকলেন গুপ্ত সৈন্যের কর্ত্তা হ'য়ে। তখন রাজকুমার উদয়াদিত্যও সৈন্য চালনা করতেন।

সে সময় ফিরিঙ্গি ডাকাত এ দেশে অনেক ছিল। তাদের নৌকা ছিল, জাহাজ ছিল। জলে থেকে যুদ্ধ করতে, নিশানা করে' কামান দাগতে তাদের মত আর কেউ ছিল না। প্রতাপ

তাঁর সৈন্যদের বেশী বেশী টাকা দিতেন, নিজে তাদের যত্ন করতেন, তাই অনেক ফিরিঙ্গি ডাকাতি ছেড়ে প্রতাপের সৈন্য হ'লেন। তাঁদের কর্ত্তা ছিলেন ফিরিঙ্গি বীর রুডা।

দমদমা আর লোহাগড়ার মাঠে মাঠে সারি সারি ঘর উঠলো। বাঙ্গালার ভাল ভাল কামার এসে প্রতাপের জন্য বড় বড় কামান, সুন্দর সুন্দর বন্দুক, ভারি ভারি গোলাগুলি তৈয়ারী করতে লাগলো। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, কামানে বন্দুকে গোলাগুলি-বারুদে প্রতাপের গড়গুলো সব ভরে উঠে।

বাঙ্গালা দেশে কত নদ কত নদী। প্রতাপ দেখলেন জলেও যুদ্ধ করতে হবে স্থলেও করতে হ'বে। তখন বাঙ্গালার ছুতার এল, সুন্দর বনের বড় বড় শক্ত গাছ কাটলো--লোহা তামা পিতল এনে ভাল ভাল জাহাজ গড়তে লাগলো।

সে কি আজকের কথা! দু' হাজার বৎসর আগেও আমাদের জাহাজ রোমনগরে যেত। তখন রোমরাজ্যে প্রতি বৎসর ভারতের সাড়ে দশ লক্ষ টাকার জিনিষ বিক্রয় হ'তো! বিদেশী বণিকেরা নানা রকম জিনিষ এনে বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম বন্দরে কেনা-বেচা করতো। তখন সপ্তগ্রাম একটা মস্ত সহর ছিল। তার দুর্গের পার্শ্ব দিয়ে সরস্বতী নদী বয়ে যেত। সেই নদীর ঘাটে তখন কত জাহাজ বাঁধা থাকতো। এখনো সে নদী আছে, কিন্তু তাতে এক হাঁটু জলও থাকে না। যেখানে জাহাজ ভাসতো সেখানে এখন ধানের চাষ হয়!

লাঙ্গল চষতে চষতে কখন বা লাঙ্গলের ফালে জাহাজ বাঁধা শিকল উঠে। যখন বৌদ্ধ রাজারা এ দেশে রাজত্ব করতেন তখন বৌদ্ধ পুরোহিতেরা এ দেশের জাহাজে চড়ে' চীনে, জাপানে যাতায়াত করতেন। চাটগাঁয়ে তখন মস্ত বন্দর ছিল। বাঙ্গালার সুজনী আর রেশমী কাপড় বোঝাই করে' এককালে বাঙ্গালার জাহাজ ইজিপ্ত, আরব, পারস্য, ইতালী প্রভৃতি নানা স্থানে যেত। মালদহ যখন বাণিজ্যের জন্য প্রধান হয়েছিল, তখন ভিখু শেখ নামে এক সওদাগর তিন খানা জাহাজ বোঝাই বহুমূল্য কাপড় রুসিয়া দেশে পাঠিয়েছিলেন। গৌড়ের একজন শ্রেষ্ঠ বণিক ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যের একটা গান বলি শোন। সওদাগরের অনেকগুলো জাহাজ এসে গৌড়ের ঘাটে লেগে রয়েছে। একজন দাসী জল আনতে এসে দেখে ঘাটে নামার উপায় নাই। তখন সওদাগর আর দাসীতে যে কথা হয়েছিল, মালদহের গম্ভীরা-উৎসবের গানে সেই কথা আছে।

দাসী। কিস্‌কে জাহাজ লাগি এহি গৌড়া সাহারামে।

সওদাগর। আয়ে হামা ধনপতি সদাগর আয়ি দিল্লী সারাবাসে।

দাসী। ঘাটকে জাহাজ বোহার দুরা লে যাও হে পানী ভারনেসে আয়ি।

সওদাগর। মাসুল দিয়া হম্মা সোওয়া পঞ্চাশামে, ঐহিনা বাদ্‌শাকে আগে।

দাসী। গৌড়ে কিনারা হ্যায় ভাগীরথী নদী
জাহাজমে ছালিয়া হ্যায় ধনপতি।
সব ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বোহারাসে,
নাহি আদ্মি পাবে পাণী ভর্নে।

আর একজন ধনপতি সওদাগর সিংহল দেশে বাণিজ্য করতে যাবেন। বাঙ্গালার কত বহুমূল্য জিনিষ একত্র করেছেন। তাঁর নৌকা গুলি সব জলের মধ্যে ডুবানো ছিল। তিনি বেছে বেছে বাঙ্গালী ডুবারু আনলেন। তারা জলে ডুব দিয়ে কেমন করে সওদাগরের নৌকা তুলছে দেখ—

প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণের বান্ধা যার (১) বৈঠকীর ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল (২) গাবর॥
তবে ডিঙ্গা খান তোলে নামে গুয়া রেখা।
দুই প্রহরের পথে যায় (৩) মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গা খান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশীগজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে চন্দ্র পাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥ (৪)

---

(১) বৈঠকীর ঘর = বৈঠকখানা। (২) গাবর = দাঁড়ি মাঝি।
(৩) মালুম কাঠ = মাস্তুলের কাঠ। (৪) আল = আলো করা

আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোট স্নুটি।

যাহে ভরা দিল (৫) চালু (৬) বায়ান্ন পউটি ॥ (৭)

প্রতাপ হিন্দু ছিলেন, তাই বলে মুসলমান কি খ্রীষ্টান দেখলে ঘৃণা করতেন না। তিনি যেমন দেব দেবীর মন্দির গড়ালেন, তেমনি খ্রীষ্টানের গির্জ্জা হলো, মুসলমানের মসজেদ উঠলো। প্রতাপ নিজে গির্জ্জা দেখতে যেতেন, নিজে মসজেদের খবর নিতেন। সে মসজেদের নাম ছিল টেঙ্গা মসজেদ। তার পাঁচটি গম্বুজ। সেই একশ' হাত উঁচু মসজেদের মধ্যে প্রতাপের মুসলমান প্রজারা প্রতাপের মঙ্গল-কামনায় পরমেশ্বরকে ডাকতো॥

আগ্রা থেকে আসার সময় প্রতাপ বলেছিলেন তিনি মনের মত করে তাঁর সোণার যশোরকে সাজাবেন। প্রতাপের গড় হ'লো মন্দির হ'লো, গির্জ্জা হ'লো, মস্‌জেদ হলো, তা'ছাড়া বারদুয়ারী রাজবাড়ী, হাউজখানা এমনি আরও কত কি হ'লো। দেখতে দেখতে যশোর সেজে উঠলো।

প্রতাপের বায়ান্ন হাজার ঢালী হ'লো, একান্ন হাজার তীরন্দাজ দাঁড়ালো—হাতী ঘোড়ার ত কথাই নাই।

"বায়ান্ন হাজার যার ঢালী

ষোড়শ হল্‌কা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি।"

তাঁর সঙ্গে আর পারে কে? প্রতাপ তখন নিজের নামে টাকা তৈয়ার করতে লাগলেন।

---

(৫) ভরা দিল = বোঝাই করিল। (৬) চালু = চাউল

(৭) পউটা = ৪০ মণ। বায়ান্ন পউটীতে ২০৮০ মণ।

রাজা বসন্ত রায় এ সব দেখে শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি প্রতাপকে কত করে' বুঝিয়ে বল্লেন বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করলে ভাল হবে না। প্রতাপ সে কথা শুনলেন না।

একদিন প্রতাপ কাকার কাছে যেয়ে বল্লেন, "কাকা, আপনার চাকৃসিরি গ্রামখানা আমায় দিন। আমি সেখানে জাহাজ রাখবো। রাজা বসন্তরায় প্রতাপের কথা শুনলেন না। লোকে বল্‌তে লাগলো—

"সারা রাত পাক ফিরি
তবু না পাই চাকৃসিরি।"

প্রতাপের প্রাণে বড় ব্যথা লাগলো। তাঁর বড় রাগ হলো—বড় অপমান বোধ হলো। তিনি শেষে সাগর দ্বীপেই জাহাজ রাখলেন।

চারিদিকে সমুদ্র—তার মধ্যে ছোট একটা দ্বীপ। প্রতাপ বল্লেন "এই সাগর দ্বীপেই আমার জাহাজ থাকবে।" বাঙ্গালার জাহাজ সমুদ্রের জলে দুলে' দুলে' ভাসতে লাগলো —ভাস্‌তে ভাস্‌তে দুল্‌তে লাগলো।

জাহাজ-ঘাটায় সারি সারি জাহাজ বাঁধা। তাদের মস্ত উঁচু মাস্তলে প্রতাপের নিশান উড়লো। জাহাজে কামান উঠলো, গুলি বারুদ বন্দুক উঠলো। বাঙ্গালী সৈন্য 'জয় প্রতাপের জয়' বলে' জাহাজে চড়লো।

দশম পরিচ্ছেদ

ফুলের মত প্রতাপের ছোট একটী মেয়ে ছিল। নাম তার বিন্দু। বিন্দু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো দেখে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপ তার বিয়ে দিলেন। প্রতাপের মেয়ের বিয়ে—কত বাজনা বাজলো, রোসনাই হলো, কত ধূমধামের পর বিয়ের গোল থেমে গেল। রামচন্দ্র কিছুদিন শ্বশুরবাড়ীতেই থাকলেন।

রাজা বসন্তরায়ের ছেলেরা গোপনে প্রতাপের সঙ্গে শত্রুতা করতে লাগলেন। তাঁরা রামচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর রাজ্যটা লওয়ার জন্যই প্রতাপ বিন্দুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন!

রামচন্দ্রের সঙ্গে রমাই নামে একজন ভাঁড় ছিল। রাজা বসন্তরায়ের ছেলেদের কৌশলে পড়ে' সে একদিন স্ত্রীলোকের বেশে প্রতাপের অন্দরে প্রবেশ করলে! এ কথা প্রকাশ হ'তে বেশী সময় লাগলো না। প্রতাপ ভাবলেন, "নিশ্চয়ই আমার জামাই সাহায্য করেছে, তা না হলে রমাই ভাঁড়ের সাধ্য কি যে আমার মেয়ে-মহলে যেতে পারে!" রাগে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। তিনি আদেশ করলেন, "এ অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। জামাইয়ের মাথা কেটে আন—তা না হলে' অপমানের শোধ হবে না!"

রামচন্দ্র এর কিছুই জানতেন না। যখন শুনলেন রমাইয়ের

অপরাধে রাজা তাঁরই মাথা কাট্‌তে বলেছেন তখন দেখলেন চারিদিকে খাড়া পাহারা! প্রহরীদের হাতে খোলা তরোয়াল ঝক্ ঝক্ করছে। পালাবার আর পথ নাই!

হায় কি হবে? পালাবার আর পথ নাই! বিন্দু শুনে' কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখের জল মুক্তার মত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগলো। শেষে রাজকুমার উদয়াদিত্যের সঙ্গে পরামর্শ করে' রামচন্দ্র অনেক কৌশলে রাজবাড়ী থেকে পলায়ন করলেন। ভোর হ'তে না হ'তেই প্রতাপের কানে খবর গেল। যশোরে ধর ধর মার মার রব উঠ্‌লো। ঘোড়ায় চড়ে সওয়ার ছুটলো, হাতীর পিঠে সর্দার গেল। ছিপে উঠে তীরন্দাজ চল্‌লো। চারিদিকে হৈ হৈ, চারিদিকে রৈ রৈ!

*　　*　　*　　*　　*

প্রতাপের ঘোড়া ফিরেছে, হাতী ফিরেছে। নৌকায় চড়ে' তীরন্দাজ ফিরেছে। কেউ রামচন্দ্রকে আন্‌তে পারেনি। প্রতাপ মনে মনে বড় অপমান বোধ করলেন! তাঁর বিশ্বাস হ'লো রাজা বসন্তরায়ের জন্যই এত অপমান! তাঁর মনের মধ্যে পাঁজার আগুন জ্বলতে লাগলো!

প্রতাপ বিন্দুকে আর শ্বশুর-বাড়ী পাঠালেন না। রামচন্দ্রও প্রতাপের উপর রাগ করে' বিন্দুর আর খোঁজ-খবর নিলেন না। দিন যায় মাস যায় বৎসর যায়। ফুলের মত সুন্দর বিন্দু মনের দুঃখে শুকিয়ে উঠতে লাগলো। বিন্দু শেষে

নিজেই ডিঙ্গা সাজিয়ে স্বামীর কাছে রওনা হলো। সুন্দরী বিন্দুর সুন্দর ডিঙ্গা নাচতে নাচতে রাজহংসের মত জল কেটে দুল্‌তে দুল্‌তে ভেসে চল্‌লো।

ওই ত রাজধানী। ওইখানেই ত বিন্দুর স্বামী আছেন। লোকে তীর্থে গেলে যেমন দূরে দেবমন্দির দেখেই প্রণাম করে, বিন্দুও তেমনি রাজপুরী দেখেই নৌকা থেকে প্রণাম করলেন। মাঝিকে বল্লেন, 'মাঝি ঐ ঘাটে নৌকা বাঁধ।' ডিঙ্গা বাঁধা হলো।

বিন্দুর মনে অভিমান এল—স্বামী যদি আদর করে' নিয়ে যান তবেই যাব।

দিনের পর দিন গেল। রাজা রামচন্দ্রের কত ছিপ কত নৌকা ডঙ্কা দিয়ে চলে' যায়—কত ঘোড়া ঘাটের ধারে টগ্‌বগিয়ে ছোটে, কত হাতী হাওদা বেঁধে সেজে-গুজে নদীর ধারে আসে, রেশমী কাপড়ে ঢাকা কত শিবিকা সোণার ঝালোর ঝল-ঝলিয়ে বাজার বেহারা বয়ে নিয়ে যায়। দুঃখিনী বিন্দুর জন্য কেউ আসে না!

এমনি করে অনেক দিন গেল। একদিন পূর্ব্বের সূর্য্য যখন রাঙ্গা হ'য়ে টুপ করে পশ্চিমে ডুবে গেল, নদীর জল রক্তরাঙ্গা হয়ে ছুট্‌তে লাগলো, শেষে সেই রাঙ্গা জল যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হ'য়ে, কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে' ডেকে উঠলো বিন্দু তখন তার চোখের জলে ভেজা আঁচলখানি দিয়ে দুই চোখের জল মুছে বল্লেন 'মাঝি ডিঙ্গা খোল!' মাঝিরা ডিঙ্গার

বাঁধন খুলে দিলে। বিন্দুকে নিয়ে বিন্দুর ডিঙ্গা কাশীর দিকে ভেসে চল্‌লো।

তাঁদের জন্য সেই ঘাটে যে হাট বস্‌তো সেই দিন থেকে তার নাম হ'লো বৌঠাকুরাণীর হাট। এখনো সেখানে হাট বসে, আজও লোকে বলে বৌঠাকুরাণীর হাট।

— —

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজা বসন্ত রায় প্রতি বৎসর পিতার শ্রাদ্ধ করতেন। এবারও খুব সমারোহ করে' শ্রাদ্ধ আরম্ভ করলেন। প্রতাপের নিমন্ত্রণ হ'লো।

রাজা শ্রাদ্ধ করতে বসলেন। রাজপুরীর দ্বার খোলা। যার ইচ্ছা যাচ্ছে আস্‌ছে দাঁড়াচ্ছে। প্রতাপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। আসার সময় মনে করলেন শত্রুর পুরীতে যাব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাই।

প্রতাপ যখন শ্রাদ্ধের স্থানে প্রবেশ করেন তখন রাজা বসন্তরায় দাসদের বল্‌ছিলেন 'ওরে গঙ্গাজল নিয়ে আয়।' প্রতাপ মনে করলেন আমাকে দেখেই কাকা তাঁর 'গঙ্গাজল' তরোয়াল আন্‌তে বল্লেন কেন! তবে কি তিনি আমায় বধ করার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছেন! প্রতাপের এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ আজ আর কোন বাধা মান্‌লো না। তিনি মুহূর্ত্তে আপন অসি খুলে' ফেল্লেন। বিপদ উপস্থিত দেখে বসন্তরায় চীৎকার করে' বল্লেন 'কে আছিস্ আন্ আন্ আমার গঙ্গাজল আন্!' রাজপুত্র গোবিন্দরায় পিতার গঙ্গাজল অসি নিয়ে নিকটে আস্‌তে না পেরে প্রতাপকে লক্ষ্য করে' ফেলে মারলেন! লক্ষ্য ঠিক হলো না. সেই ভীম অসি পাথরের মেজেতে পড়ে' ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে প্রতাপের অস্ত্রে রাজা বসন্তরায়ের মৃত্যু হলো! পুরীর মধ্যে হাহাকার

উঠ্‌লো! অন্যান্য রাজকুমারেরা এসে প্রতাপকে আক্রমণ করলেন। তখন চারিদিকে কাটাকাটি চারিদিকে মারামারি হ'তে লাগলো! দেখতে না দেখতে গোবিন্দের কাটা মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো!

প্রতাপ মহাপাপ করলেন! আপন হাতে পিতার তুল্য পিতৃব্যের, ভ্রাতার তুল্য পিতৃব্যপুত্রের প্রাণ বধ করলেন! পৃথিবীতে পাপ করে' কেউ পালাতে পারে না। একদিন না একদিন তার শাস্তি পেতেই হয়। প্রতাপকেও সে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

প্রতাপকে পাপের পথে দেখে যশোরদেবী আর তাঁর সহায় থাকলেন না—প্রতাপের আত্মীয়-স্বজনেরাও অনেকে ভয়ে ভয়ে সরে যেতে লাগলেন!

প্রতাপ এখন মুক্ত। তিনি এখন সমস্ত যশোরের রাজা। মধুমতী নদী তাঁর রাজ্যের পূর্ব্বের দিকে তর তর করে' বয়ে' চলেছে, পশ্চিমে গঙ্গা আর দক্ষিণে নীল সমুদ্র। সে নদীর বুকে নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে প্রতাপের ছিপ ছুটে বেড়ায় —সে সমুদ্রের ঢেউএর মাথার উপর প্রতাপের জাহাজ প্রতাপের কামান-গুলি-বারুদ নিয়ে নাচে দোলে জল কেটে চলে। নদীর তীরে তীরে প্রতাপের গড়। সে সব গড়ে জোয়ান জোয়ান সৈন্যেরা কুচ্-কাওয়াজ করে, বল্লম ছোড়ে, বন্দুক মারে। প্রতাপের পর্ত্তুগীজ সর্দ্দারেরা জাহাজে চড়ে' বাঙ্গালী সৈন্যদের জলযুদ্ধ শেখায়।

এ সব কথা যখন আকবর বাদশাহের কাণে গেল তখন তিনি চিন্তিত হলেন। শেষে মানসিংহের উপর বাঙ্গালায় যাওবার আদেশ হলো। মানসিংহ বাইশজন আমীর সঙ্গে নিয়ে আগ্রা থেকে যাত্রা করলেন। হাজার হাজার বাদশাহী সৈন্য, হাজার হাজার হাতী ঘোড়া জল স্থল কাঁপিয়ে বাদশাহের জয় গান করতে করতে অগ্রসর হলো। বাঙ্গালায় তখন একটা মরণ-বাদ্য বেজে উঠলো। প্রতাপের মুখের দিকে চেয়ে বাঙ্গালী বীরেরা তাঁর দুর্গে এসে দাঁড়ালেন।

মানসিংহের ডঙ্কা বাজলো—ভেরী বাজলো। বাদশাহের কামান ডাকলো বুম্ বুম্। হাজার জোয়ানের হাতে হাজার তরোয়াল। হাজার সওয়ারের হাতে হাজার বল্লম। গাড়ীতে গাড়ীতে বারুদ গুলি কামান বন্দুক। বাঙ্গালাময় একটা হৈ হৈ রব উঠলো। তাড়াতাড়ি যশোরে আসার জন্য মানসিংহ বন-জঙ্গল কেটে একটা রাস্তা প্রস্তুত করলেন। আজও তাকে গৌড়-বঙ্গের পথ বলে।

গৌড়-বঙ্গের পথে মানসিংহের সৈন্য আসতে লাগলো। ছেলে মেয়ে বুড়োরা প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে গ্রামে, শেষে লোকালয় ছেড়ে বনের মধ্যে মাথা লুকালো।

প্রতাপ তাঁর সেনাপতিদের ডেকে বল্লেন,—"ভাই মানসিংহ আসছেন—বাদশাহের লোক-লস্কর-সিপাহী আসছে। ওই শোন তাদের কামান ডাকে—ওই শোন তাদের হাতী নাদে—ওই শোন তাদের ডঙ্কা বাজে। ওই দেখ ভাই যশোর-দে বীর

মন্দিরে আজ বাঙ্গালার জয়পতাকা উড়ছে—ওই শোন ভাই বাঙ্গালীর গড়ের মধ্যে বাঙ্গালীর কামান ডাকছে। বল, জয় বাঙ্গালার জয়।"

হাজার লোক গর্জ্জে উঠলো, "জয় বাঙ্গালার জয়—জয় প্রতাপের জয়।"

প্রতাপ আবার বল্লেন—"ভাই! আজ মার নামে প্রতিজ্ঞা কর মার মান রাখবে। আজ বাঙ্গালীর নামে প্রতিজ্ঞা কর যে বাঙ্গালার দুঃখ ঘুচাবে। আজ হিন্দুর নামে প্রতিজ্ঞা কর যে মোগলকে দেশের বাহির করবে। চল ভাই! আজ ধারাল অসি নিয়ে যুদ্ধ জয় করতে চল। বল, জয় যশোর-দেবীর জয়।"

আবার লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি হলো "জয় যশোর-দেবীর জয়।" সেই গর্জ্জনে বাঙ্গালা কাঁপলো। গড়ে গড়ে কামানের শব্দ হলো। মানসিংহ শুনলেন প্রতাপের কামান ডাকছে—বাঙ্গালীর কামান ডাকছে—বাঙ্গালার বীর মরণ পণ করে' গর্জ্জাচ্ছে। মান-সিংহ ভীত হলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ধূধূ ধূধূধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দামামা দম দম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে ॥
কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে ॥

যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! বাদশাহের সঙ্গে প্রতাপের ভয়ানক যুদ্ধ বেধে উঠলো। মৌতলা থেকে যশোর পর্য্যন্ত কেবল সৈন্য, কেবল ঘোড়া, কেবল হাতী। যে যার পারে সে তার মাথা কাটে। রক্তে নদী বয়ে যেতে লাগলো। সেই রক্তে রাঙ্গা তরোয়াল হাতে প্রতাপ হাঁকতে লাগলেন—জয় যশোর-দেবীর জয়। জয় বাঙ্গালার জয়।

প্রতাপ দেখলেন গড়ের মধ্যে আশ্রয় না নিলে আর উপায় নাই। তিনি সৈন্য নিয়ে গড়ের মধ্যে গেলেন। গড়ের কামান আগুনে রাঙ্গা বড় বড় গোলা ছিটিয়ে বাদশাহী সৈন্যদের ব্যস্ত করে' তুল্লে। মানসিংহ দেখলেন যুদ্ধে বুঝি আর জয় হয় না—বুঝি বাঙ্গালা স্বাধীন হয়—বুঝি প্রতাপের মাথায় বাঙ্গালার রাজমুকুট উঠে!

মানসিংহ বাদশাহী সৈন্যদের ডেকে বল্লেন, "আজ বাদশাহের মান যায়—বাদশাহের বাঙ্গালা যায়! চল আগে

চল। গড়ের উপর লাফিয়ে পড়। কামানের গুলি দিয়ে বাঙ্গালীর গড় ভেঙ্গে চুরমার করে' দাও।"

আবার বাহশাহী কামান ডেকে উঠলো। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা যেয়ে গড়ের ভিতরে বাহিরে গায়ে আগুনের মত পড়তে লাগলো। প্রতাপ দেখলেন আর গড়ে থাকা বৃথা—এ গড় আর রক্ষা হবে না।

প্রতাপ তখন বন্ধুদের ডেকে বল্লেন—"ভাই! আজ বাঙ্গালার শেষ দিন। চল ভাই! বীরের মত লাফিয়ে পড়ি—যুদ্ধ করতে করতে বীরের মত মরি।"

প্রতাপের বীর সৈন্য গর্জ্জে উঠলো—"জয় বাঙ্গালার জয়—জয় প্রতাপের জয়।"

ঝন্ ঝন্ করে' দুর্গের দ্বার খোলা হলো। বাঘ যেমন হরিণের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, মুক্ত তরোয়াল-হাতে বাঙ্গালীসৈন্য তেমনি বাদশাহী সৈন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো!

তখন চারিদিকে মার মার—হুম্ হুম্—বুম্ বুম্! মানসিংহের বাইশ জন আমীর ধরাশায়ী হলেন। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তাঁর সৈন্যেরা এসে প্রতাপকে ঘিরে ধরলে। প্রতাপ যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর মাথার উপর তখন হাজার শকুনি রক্তের আশায় লক্ লক্ করে' ফিরছিল—প্রতাপ যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর অস্ত্রের ঘায় কত শত্রুর শির মাটিতে গড়াতে লাগলো। অকস্মাৎ রাজা বসন্তরায়ের ছেলে কচু রায় এক কোপে প্রতাপের দক্ষিণ বাহু কেটে ফেল্লেন! অস্ত্র সমেত বীরের বাহু

রক্তমাখা ধূলায় পড়ে গেল। প্রতাপ অজ্ঞান হয়ে সেই রক্তনদীর মধ্যে একটা মরা ঘোড়ার গায়ের উপর ঢলে পড়লেন!

ঝম্ ঝম্ করে' বাজনা বেজে উঠলো। বাদশাহী সৈন্য আনন্দে জয়ধ্বনি করলে। মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করলেন! প্রতাপের লীলা শেষ হ'লো।